প্রাণ-প্রতিষ্ঠা

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

ব্যানার্জ্জি, গাঙ্গুলী এণ্ড কোং
পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক
কর্ণওয়ালিস বিল্ডিংস্, কলিকাতা।

দাম দেড় টাকা।

প্রাণ-প্রতিষ্ঠা

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

ব্যানার্জ্জি, গাঙ্গুলী এণ্ড কোং
পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক
কর্ণওয়ালিস বিল্ডিংস্, কলিকাতা।

দাম দেড় টাকা।

প্রকাশক—
শ্রীঅলীনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এ,
১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

কলিকাতা—৩৩ নং গৌরীবেড় লেন
সূর্য্য প্রেসে
শ্রীসুবোধচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

"প্রাণ-প্রতিষ্ঠা"

সেনহাটী

কৃষ্ণচন্দ্র ইনষ্টিটিউটের

ভাই-বোনদের

হাতেই তুলে দিলুম।

কৈফিয়ৎ

বইখানা পাঁচ বছর আগে লেখা হয়েছিল। তখন Village Organisationএর ধুয়া ওঠে নাই, পল্লী-গঠনের কথা এত শোনা যায় নাই—এখনকার মত এত স্কীমও বেরোয় নাই। কাজেই ভয় হয় আজ এ পুরাণো কথা আর চল্‌বে না। কিন্তু "বিজলী" কাগজে যখন এখানা ধারাবাহিক ভাবে বার হচ্ছিল, তখন ছ'চার জন বলেছিলেন যে, তাঁদের ভাল লাগ্‌ছে।

সেনহাটী কৃষ্ণচন্দ্র ইন্‌ষ্টিটিউটের ভাই-বোনরা কাজে কিছু করে উঠতে পারুন বা না-ই পারুন, কল্পনায়ও তাঁরা পল্লীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠার স্থান দিয়েছেন। এ বইখানা তাঁদের হাতে তুলে দিয়েছি। দু'চার পয়সা যদি লাভ হয়, তা তাঁদেরই অনুষ্ঠানের কাজে ব্যয়িত হবে। ইতি

সেনহাটী,
২৬শে আশ্বিন, ১৩৩০

লেখক

প্রাণ-প্রতিষ্ঠা

প্রথম পরিচ্ছেদ

[১]

বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ-পরীক্ষা চুকাইয়া সতীশ যে দিন গৃহে ফিরিয়া আসিল, সেই দিনই জননী মোক্ষদাময়ী পুত্রের চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিলেন—"এবার কিন্তু ঘরে একটি লক্ষ্মী আন্‌তে হবে, সতু।"

"দুটো দিন আগে বিশ্রাম কর্‌তেই দাও" বলিয়া সতীশ পার্শ্বে দণ্ডায়মানা ভগ্নীকে কহিল—কিরে কমল মুখটা অমন ভার করে রয়েচিস্ কেন?"

"কথা কইলে পাছে তোমার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটে, তাই ভয়ে ভয়ে চুপ করে আছি।"

ছেলেবেলা হইতেই এই ভগ্নীটি সতীশের উপর সকল রকমের আব্দার অবাধে চালাইয়া আসিয়াছে। সতীশ এতই কোমল প্রকৃতির এবং এমনিই স্নেহপ্রবণ যে, কোন কারণে কমলার মুখে এতটুকু বিষাদের ছায়া দেখিলে তাহার সারাটা চিত্ত বেদনায় ভরিয়া ওঠে। কমলার কোন কথা অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা তাহার নাই।

প্রাণ-প্রতিষ্ঠা

পাঁচ বৎসর হইল কমলার বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু এই দীর্ঘ কালের মধ্যে পূর্ণ একটি বৎসরও সে স্বামীর ঘর করিতে পারে নাই। সতীশের পিতা তারানাথ রায় বহু অর্থব্যয়ে মহেশপুরের জমিদারের একমাত্র পুত্র হেমেন্দ্রলালের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়া আশা করিয়াছিলেন যে, কমলার জীবন সুখেই অতিবাহিত হইবে—কিন্তু, শীঘ্রই তাহার এই ভুল ভয়ানক ভাবে ভাঙ্গিয়া গেল। পিতার মৃত্যুর পর জমিদারীর কর্তৃত্ব পাইয়া হেমেন্দ্রলাল উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতায় চরিত্রের শিষ্টতা হারাইয়া ফেলিল। কুসঙ্গে মিশিয়া, কুৎসিত আমোদে মত্ত হইয়া সে নির্ম্মম ব্যবহারে কমলাকে পীড়ন করিতে লাগিল—এমন কি সুরাপানে উত্তেজিত হইয়া এক দ্বিপ্রহর রজনীতে সে কমলাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়াও দিয়াছিল।

অবশেষে কমলার স্নেহময়ী শাশুড়ী বধূর অবমাননায় ব্যথিত হইয়া তাহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন।

বুকভরা বেদনা ও লাঞ্ছনা লইয়া কমলা যে দিন পিতৃ-গৃহে ফিরিয়া আসিল, সেই দিন হইতেই সতীশ ভগ্নীর দুঃখের অংশ গ্রহণ করিবার জন্য জীবনের সকল উৎসব ও আনন্দ বর্জ্জন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল।

আজ যখন কমলা বিবাহ না করিবার জন্য অনুযোগ দিয়া সতীশকে শ্লেষ করিল, তখন সে, দেবার মত কোন জবাব খুঁজিয়া পাইলনা। কোন মতে কতকগুলি অর্থহীন শব্দোচ্চারণ করিয়া সে বিছানায় শুইয়া পড়িল। দাদার চিত্তের কোন যায়গায় একটা ঘা লাগিয়াছে মনে করিয়া কমলা অপ্রতিভ হইয়া কহিল—"হাত মুখ ধুয়ে একটু কিছু খেয়ে নাও দাদা, তারপর ওসব কথা হবে'খন।" উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া সে খাবার আনিবার জন্য কক্ষান্তরে প্রস্থান করিল।

সতীশ নিতান্ত অপরাধীর মত ভগ্নীর আদেশ পালনে তৎপর হইল। মোক্ষদাময়ী সতীশকে কলিকাতার নানা সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। একখানি আসন ও একগ্ল্যাস জল লইয়া আসিয়া কমলা দেখিল যে, দাদার তখনো হাত মুখ ধোয়া হয় নাই। বিরক্তি প্রকাশ করিয়া সে কহিল—"মা, তুমি একটু থামো। ও বাড়ীর জ্যাঠাইমা তোমায় ডেকে পাঠিয়েছেন, এখনি কি কাজ আছে। তুমি যাও, দাদাকে আর বকিয়ো না। সেই সকালে দু'টি খেয়ে এসেছে!"

এই মেয়েটিকে বাড়ীর সকলেই একটু ভয় করিয়া চলিত; সুতরাং মোক্ষদাময়ী বিনাবাক্যব্যয়ে প্রস্থান করিলেন। কমলা একখানা রেকাবীতে খাবার আনিয়া কহিল—"বোস দাদা, আর দেরী করো না।"

"এতগুলি খাব কি করে?" বলিয়া সতীশ আসনে উপবেশন করিল।

একখানা পাখা লইয়া কমলা দাদার পার্শ্বে বসিয়া পড়িল। সহসা তাহার মুখ মেঘাবৃত আকাশের মত গম্ভীর হইয়া উঠিল। সতীশ মাথা নীচু করিয়া খাইতেছিল, নতুবা সেই সুমিষ্ট খাদ্যগুলি কিছুতেই তাহার মুখ দিয়া গলিত না। একটা সন্দেশের আধখানা ভাঙ্গিয়া যখন সে মুখে ফেলিল, তখন কমলা ডাকিল—"দাদা?" তাহার অশ্রুপূর্ণ চোখের পানে চাইতেই সতীশের বুকটা বেদনায় ভরিয়া উঠিল। স্নেহ-কোমলকণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছে রে?"

কিছুকাল নীরব থাকিয়া কমলা কহিল—"তুমিও কি দাদা, শেষটায় আমায় এমন করে ব্যথা দেবে?"

"কেন রে? কি করেছি আমি?"

"তুমি বিয়ে করচ না বলে লোকে কত কথাই না কইছে! কি আমার হয়েছে যে, তোমরা সবাই মিলে আমার জন্য চিরকাল জীবনের

সমস্ত আনন্দ থেকে দূরে সরে থাক্‌বে ? এ কথা আজ তোমায় বলে রাখচি যে, বিয়ে করতে আর যদি অমত কর, তা'হলে তোমাদের সংসার ছেড়ে দু'চক্ষু যে দিকে যায়, সেই দিকেই চলে যাব।"

সতীশ বুঝিল কতবড় একটা নির্ম্মম আঘাত তাহার প্রচ্ছন্ন বেদনায় ঘা মারিয়া তাহা একেবারে দুঃসহ করিয়া ফেলিয়াছে। "দুঃখ করিসনি বোন্, তোর দাদা কখনো তোর দুঃখের বোঝা বাড়িয়ে তুল্‌বে না।— আমি চিরদিন তোর কথা নির্ব্বিবাদে মেনে চল্‌ব।"—বলিয়াই সতীশ উঠিবার উপক্রম করিল।

কমলা তাহার ডান হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"সে হবে না, দাদা! আমি নিজে সব তৈরী করেছি—না খেয়ে কিছুতেই তুমি উঠতে পারবে না।"

"আর একদিন খাব আজ আর নয়।" বলিয়া সতীশ উঠিয়া দাঁড়াইল। কমলা কথাটিও কহিল না, যেমন ছিল তেমনই বসিয়া রহিল। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

শূন্য ঘরে একা বসিয়া কমলা ভাবিতেছিল, পাষাণের মত দুর্ব্বহ এই বেদনার বোঝা তাকে এমনি অপদার্থ করিয়া তুলিয়াছে যে, নিজের উপর তার আর এতটুকু কর্তৃত্ব নাই। সে কি করিবে, কোথায় যাইবে— হৃদয়ের এই বিষম বেদনার স্তূপ কোথায় নামাইয়া রাখিয়া একটু আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে, কিছুতেই ত স্থির করিতে পারে না।

রাত্রে খাবার সময় কমলাকে না দেখিয়া সতীশ বুঝিল যে, ব্যাপার কিছু গুরুতর দাঁড়াইয়াছে। নিঃশব্দে আহার শেষ করিয়া যখন সে দুধের বাটীতে চুমুক দিল, তখন মোক্ষদাময়ী কহিলেন—"আর অমত করিসনে, সতু। এত কষ্ট করে তোকে মানুষ করেছি, কবে মরে যাই, আমার এই কথাটা ঠেলিসনে।"

সতীশ কহিল—"কমলকে ত বলেই দিয়েছি যে, তোমাদের কোন কাজেই আর আমার অমত নেই।"

আহারান্তে পড়ার ঘরে বসিয়া সতীশ পান চিবাইতেছিল। কমলা আসিয়া তাহার পিছনে দাঁড়াইল। মুখ না ফিরাইয়াই সতীশ জিজ্ঞাসা করিল—"এতক্ষণ কোথায় ছিলি তুই ?"

কমলা কহিল—"রাগ করোনা দাদা, ভারি অন্যায় করেছি আমি।"

"তুই আবার কখন কি করলি ?"

কমলা নীরব রহিল—চেষ্টা করিয়াও কিছু বলিতে পারিল না। সতীশ জিজ্ঞাসা করিল—"তোর হয়েছে কি রে কমল ?"

"আর যে পারি না দাদা !"

সতীশ তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল—"চিরটাকালই কি আর এমনি থাকবে ? নদী যতই বেগে না বয়ে চলুক, যতই না উঁচু হয়ে ফুলে উঠুক—তার জীবনে একদিন ভাঁটার টান পড়বেই। ঘা খেয়ে খেয়ে হেমেন্দ্রও একদিন তোর পাশে এসে দাঁড়াবে,—তখন যে তোর কাজের আর অন্ত থাকবে না !"

কমলা মনে করিয়াছিল যে, পিত্রালয়ে আসিয়া শান্তি পাইবে, কিন্তু এখানে আসা অবধি তার বুকের মাঝে আরো যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে ! সে কহিল—"আমায় সেখানে রেখে এস দাদা।"

"এতই সয়েছিস্ যদি, আরোও কটা দিন সয়ে থাক্। এখন গেলে হয়ত অমঙ্গলকেই ডেকে আনা হবে। সময় আসতে দে কমল, এইটুকু শুধু বিশ্বাস করিস্ যে সুদিন আসবেই।"

কমলা কোন কথা কহিল না। ওই সুদিনের প্রত্যাশায়ই তো এই দুর্বহ জীবনের বোঝা এতদিন সে টানিয়া বেড়াইতেছে।

[২]

"হাঁরে চেরো ! পড়াশুনা ছেড়ে, এই সক্কাল বেলা কোথায় যাচ্ছিস্ ?"

"ও বাড়ীর সতীশ দা, এসেছেন—"

"সতীশ এয়েছে তা হয়েছে কি ? যা, পড়্গে যা। যত সব কলকাতার ইয়ার ছুটিতে বাড়ী এসে গাঁয়ের ছেলেগুলোর মাথা চিবিয়ে খায়।"

মহিম মুখুজ্জে যখন এইরূপে পুত্রকে শাসন করিয়া তাহার ইহকালের উন্নতির চেষ্টা ও মনে মনে সতীশের মুণ্ডপাত করিতেছিলেন, তখন কাসিতে কাসিতে হলধর খুড়া আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন।

"কি হে বাপু, ব্যাপারটা কি ?"

"আজ্ঞে, এই সতীশের কথাই বল্‌ছিলুম। বলি, তুমি না হয় ছোক্‌রা তিনটে পাশ দিয়েচ—তোমার বাপের না হয় খুব পয়সা কড়িই আছে ; তাই বলে গাঁয়ে এসে যে তুমি আমাদের গরীবের ছেলে-পুলেদের বাবুগিরি শেখাবে, তাদের ষণ্ডা করে তুল্‌বে, তা আমরা সইব কেন ?"

"ঠিক কথাই বলেচ বাবা, হক্ কথাই কয়েচ। ওই সতীশ ছোক্‌রা কি আমার কম ক্ষতি করেচে ? সেই যে কেশবপুর হতে ছেলেটার একটা সম্বন্ধ এসেছিল, সতীশইত তা ভেঙে দিলে। কেলোকে ভুলিয়ে বুঝিয়ে দিলে যে, উপার্জ্জনক্ষম না হওয়া পর্য্যন্ত বিয়ে করা উচিত নয়। সম্বন্ধটা ছিল ভাল, তারা বেশ দুপয়সা দিতেও চেয়েছিল ; কিন্তু ছেলেটা এম্নি বিগড়ে গেল যে, মার-ধর করেও তাকে কিছুতেই শোধরাতে পারলুম না। শেষে বাধ্য হয়ে তাদের বল্‌তে হ'ল যে ছেলের এখন বিয়ে দেব না। কিন্তু কি চুণকালিই মাখতে হ'ল।"

মহিম মুখুজ্জে কিছুকাল চুপ করে থেকে চাপা গলায় বল্লেন—"ওই ছেলেটাকে কি কিছুতেই জব্দ করা যায় না?"

"দেখ মহিম, তারানাথ রায়ের এই পুত্রকে ইচ্ছে করলে আমি ছারপোকার মত টিপে মারতে পারি।"

খুড়ো-ভাই-পো যখন এমনি করিয়া সতীশের মঙ্গল কামনা করিতেছিলেন, তখন সতীশচন্দ্র স্বয়ং সেইখানে উপস্থিত হইয়া উভয়কে প্রণাম করিয়া বসিল।

শুষ্ক মুখে হাসি আনিয়া মহিম মুখুজ্জে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভাল আছত সতু?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাদের শরীর ভালত?"

একটু কাসিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া মহিমখুড়া বলিলেন—"আমাদের কথা আর কি বলব, বাপু। পরপারের ডাক এসেছে অনেক দিন,—এখন জোর জবরদস্তি করে যে কটা দিন থাকতে পারি! তুমি না এবার কি পরীক্ষা দিয়েচ?"

"এম-এ দিয়েছি।"

"বেশ বাপু, বেশ। পাশটা করে এখন চাকরী-বাকরী করতে আরম্ভ কর, তোমরাইত গাঁয়ের আশা ভরসা।"

সতীশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"এখন তবে উঠি। সব বাড়ীগুলি একবার ঘুরে আসতে হবে।"

হলধর খুড়া কহিলেন—"যে কটা দিন বাড়ী থাকো, মাঝে মাঝে এসে দেখা দিয়ো। তোমাদের দেখলে কত যে আনন্দ হয়!"

মধ্যে মধ্যে আসিতে প্রতিশ্রুতি দিয়া সতীশ বিদায় গ্রহণ করিল। পাঠ-গৃহ হইতে সতীশকে দেখিয়া চারু বাহিরে আসিয়া ডাকিল—"সতীশ দা!" সতীশ উত্তর দেবার পূর্ব্বেই মহিম

মুখুজ্জে গর্জ্জন করিলেন—"ফের্, চেরো ফের্—হতভাগা ফের্ বলচি।"

সতীশ স্তম্ভিত হইয়া কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল—"যাও চারু, এখন পড়গে। বিকালে নদীর ধারে যেও।"

ছলছল নেত্রে চারু একবার সতীশের দিকে চাহিল—তারপর মাথা নীচু করিয়া পাঠ-গৃহে ফিরিয়া গেল। পিতার শাসন যতই কঠোর, যতই নির্ম্মম হউক না কেন, চারু তাহা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য। কিন্তু তবুও পিতা যে আজ ইচ্ছা করিয়াই সতীশের অপমান করিয়াছেন, একথা বুঝিতে পারিয়া চারুর কিশোর-হৃদয়ে বিষম আঘাত লাগিল। 'সতীশ দা' এমন কি অপরাধ করিয়াছেন, যাহার জন্য পিতা তাহার সহিত এমন অসদ্ব্যবহার করিবেন! চারুর আজ মনে পড়িল দুই বছর আগেকার কথা। কি কুসঙ্গেই না সে মিশিয়াছিল! স্কুল পালাইয়া, গাছে গাছে পাখীর ছানা পাড়িয়া যখন সে ঘুরিয়া বেড়াইত—নদীর তীরে ঝোঁপের আড়ালে লুকাইয়া থাকিয়া যখন সে কৃষকবধূদের ভরা-কলসী ঢিল ছুঁড়িয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিত, তখন পিতা তাহার কোন সন্ধানই লইতেন না,—একবার চাহিয়াও দেখিতেন না যে, সে কি করিতেছে! কেবল যখন সে পরীক্ষায় পাশ করিতে পারিত না, তখনই প্রহারের সঙ্গে সঙ্গে পিতা তাহাকে শাসাইয়া বলিতেন যে মূর্খ হইয়া থাকিলে তাহাকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিবেন। চারু ভাবিত যে, সে ভাল হইবে; কিন্তু ভাল হইবার সুযোগ সে পাইত না।

এমনই সময় বি-এ পরীক্ষা দিয়া সতীশ বাড়ী আসিল। গ্রামের অবস্থা ও ছেলেদের মতি গতি দেখিয়া তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। একদিকে ম্যালেরিয়ার সহিত কুসংস্কার মিশিয়া গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য ও

সমাজের যেরূপ ক্ষতিসাধন করিতেছে, অপরদিকে তেমনি আদর্শের অভাবে দেশের ভবিষ্যৎ আশা ও ভরসার পাত্র যাহারা, তাহারাই বিপথে চালিত হইতেছে। বিদেশে থাকিতে গোলা ভরা ধান ও পুকুর ভরা মাছের কথা বলিয়া যখন সে সহরের ছেলেদের কাছে পল্লী-সম্পদের পরিচয় দিত, তখন জীর্ণগোলার শূন্য গর্ভ আর মশকপূর্ণ ডোবার কথা তাহার মনেই আসিত না। সহরে থাকিয়া সে পল্লীর কথা শুধু কেতাবেই পড়িয়াছে—ভাল করিয়া দেখিবার অবকাশ কখনো পায় নাই। এখন সব দেখিয়া শুনিয়া তাহার চৈতন্য হইল। পুরাতন পল্লী-চিত্র পাঠ করিয়া এবং বাড়ীর অবসর প্রাপ্ত বৃদ্ধ চাকর গদাই-দাদার নিকট শুনিয়া পল্লী-জননীর যে গরিমাময় মূর্ত্তিখানি গড়িয়া সে হৃদয়-মন্দিরে স্থাপন করিয়াছিল, এখন তাহার সকল সৌন্দর্য্য যেন পচিয়া গলিয়া খসিয়া পড়িল। পল্লীর এই ঘুণ ধরা কঙ্কাল দেখিয়া সতীশ শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিল না। এই জীর্ণ কঙ্কালে মেদ-মজ্জার সঞ্চার করিয়া আবার তাহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠার বাসনা তাহার অন্তরে জাগিয়া উঠিল। সে গ্রামের সব 'লক্ষ্মীছাড়া' ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদিগকে কাজের লোক করিয়া গড়িবার চেষ্টা করিল।

সতীশ যেন যাদুকর! গ্রামে যাহারা গোঁয়ার বলিয়া পরিচিত ছিল, সর্ব্বাগ্রে তাহারাই আসিয়া সতীশের কাছে মাথা নত করিয়া দাঁড়াইল। এই সময় হইতেই চারু সতীশদাকে চিনিল। সতীশের প্রত্যেকটি কথার এমন এক শক্তি ছিল, যাহা ছেলেদের মন্ত্রমুগ্ধের মত বশ করিয়া ফেলিত। চারু কখনো সতীশদা'র উপকার বিস্মৃত হইতে পারিবে না। নিজের পূর্ব্ব চরিত্র স্মরণ করিয়া চারু যতই লজ্জানুভব করিত, ততই সতীশের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাহার কিশোর চিত্ত পূর্ণ হইয়া ভরিয়া উঠিত। আজ পিতার দুর্ব্যবহার তাই তাহার অন্তরে শেলের মত

বিঁধিয়াছে। মনের আবেগে সে বসিয়া একখানা বইয়ের পাতা দ্রুত উল্টাইতে লাগিল।

মহিম মুখুজ্জে পুত্রকে ডাকিলেন। বইখানা মুড়িয়া রাখিয়া চারু বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল।

পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি করছিলি রে?"

"অমনিই বসে ছিলুম", বলিয়া চারু মাথা নত করিল।

"দেখ, এ রকম করলে চলবে না কিন্তু। যদি পড়াশুনা করবার ইচ্ছে না থাকে, আমার বাড়ী ছেড়ে চলে যাও। শুধু বসে বসে আমার অন্নধ্বংস করবে, সে কিছুতেই হবে না।"

চারু কোন কথা কহিল না।

হলধর খুড়া বলিলেন—"তুমিত আর ছেলেমানুষটি নেই চারু! বুদ্ধিবৃত্তিও বেশ আছে—লেখা পড়ায়ও মন্দ নও। বুড়ো বাপ, গায়ের রক্ত জল করে তোমায় মানুষ করে তুল্‌ছেন—এ সব ত তোমায় বিবেচনা করে চল্‌তে হয়। লেখাপড়া শিখ্‌চ বলেই কি অভিভাবকদের অবজ্ঞা করতে হয়?"

"দাদামশাই, আমি কি করেচি?" বলিয়া চারু প্রশ্নপূর্ণ নয়নে হলধরের দিকে চাহিল।

"হতভাগা ছেলে! গুরুজনের মুখে মুখে উত্তর!"—গর্জ্জিয়া উঠিয়া মহিম মুখুজ্জে পুত্রের মস্তক লক্ষ্য করিয়া খড়ম নিক্ষেপ করিলেন।

"বাবাগো!" বলিয়া চারু দুই হাতে কপাল চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া পড়িল। ক্ষতস্থান হইতে রক্ত পড়িয়া তাহার কাপড় ভিজিয়া গেল।

হলধর খুড়া হুঁকাটি রাখিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কাসিতে কাসিতে বলিলেন—"সর্ব্বনাশ করলে! দেখি চারু, দেখি দাদা—দেখি কি হয়েচে? দুর্গা—বাঁচলুম! বেশি কিছু হয়নি; কপালটা

একটু কেটে গেছে মাত্র। তুমি অস্থির হয়ো না, মহিম! একটা জলপটি বেঁধে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ওরে! শীগগীর একটু জল নিয়ে আয়রে।"

চারুর ছোট বোন তখন পুষ্পচয়ন করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। সে দৌড়াইয়া বাড়ীর ভিতর গিয়া কাঁদিয়া কহিল—"দাদাকে মেরে ফেল্লে গো। তোমরা সব যাও।"

মহিমের বৃদ্ধা জননী আসিয়া চারুকে কোলে টানিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। মহিম বলিলেন—"ওসব আমি মোটেই পছন্দ করিনে, মা! ওকে দূর করে দাও। আমি আর ও হতভাগার মুখ দেখব না!"

হলধর খুড়া কোন মতে চারুর কপালে একটা জলপটি বাঁধিয়া দিয়া কহিলেন—"আর তাও বলি একটু আধটু শাসন না করলে ছেলে গুলো যে একেবারে বয়ে যায়! আপনি কিছু ভাববেন না বৌঠান, তেমন কিছু হয়নি। ওকে নিয়ে আপনি বাড়ীর ভেতর যান।"

অপরাহ্নে নদীতীরে চারুর বন্ধুদের নিকট, তাহার বেড়াইতে না আসিবার কারণ শুনিয়া সতীশ অতিশয় ক্ষুব্ধ হইল। কি কঠোর এই অভিভাবকের শাসন। ছেলেদের সহিত আজ সে কিছুতেই ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিল না। তাহার কেবলি মনে হইতেছিল যে তাহার বন্ধুত্বই এই সব ছেলেদের এমন বিপন্ন করিয়া তুলিতেছে। তাহাদের সকলকে বিদায় দিয়া যখন সে ব্যথিত চিত্তে গৃহে ফিরিয়া যাইতেছিল, তখন তাহার বাল্যবন্ধু ললিত পথের উপর দাঁড়াইয়া একটা ছেলের কাণ টানিয়া ধরিয়া তাহাকে ভদ্রতা শিক্ষা দিতেছিল। সতীশকে দেখিয়া অপ্রতিভ হইয়া সে কহিল—"ছেলেগুলো এমন বেয়াদব হয়ে যাচ্ছে যে, পথে চলাও দায় হয়ে উঠেছে।"

এফ-এ পাশ করিয়া ললিত গ্রামের স্কুলেই মাষ্টারী করিত। সে চারুর প্রতিবেশী।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল—"চারু এখন কেমন আছে, ললিত ?"

ভ্রূকুঞ্চন করিয়া বিরক্তিপূর্ণস্বরে ললিত কহিল—"কেন, কি হয়েচে তার ? তোমার দেখ্‌চি সব তাতেই বেশী বেশী।"

"বেশী কিছুই নয়, ললিত। ছেলেটা কেমন আছে, শুধু তাই জিজ্ঞাসা করছিলুম।"

"সে একই কথা হল, সতীশ। ছেলে অন্যায় করেচে—বাপ তাই শাস্তি দিয়েছেন!—বস্! এ নিয়ে একটা আন্দোলন করা কি সঙ্গত ? অনেকদিন হতেই দেখে আসচি আমি, কিন্তু বলিনি কখন কিছু। আজ আর না বলে থাকতে পারচিনে। বন্ধু বলেই বলচি যে, তোমার কাজটা ঠিক উচিত হচ্ছে না।"

"অনুচিত কি করেচি আমায় বুঝিয়ে দাও।"

উত্তেজিত কণ্ঠে ললিত কহিল—"শুধু অনুচিত নয়, সতীশ, তুমি যা করচ, তা খুবই অন্যায়—এমন কি আমাদের পক্ষে তা মারাত্মকও বটে।"

সতীশ হাসিয়া কহিল—"তাতো জানতুম না ললিত !"

"ছেলেগুলোকে তুমি এমনি করে তুলেচ যে, দুনিয়ার কাউকে তারা ভয় করে না। চারুটাই বা কি হয়ে গেছে! হলধর খুড়ো, যাঁকে দেখলে আমরা পর্য্যন্ত ভয়ে ভয়ে পাশ কাটিয়ে চলি,—তার মুখে মুখে উত্তর! তোমার উৎসাহ না পেলে এমন কাজ করতে সে সাহস পায় ?"

"আমায় যখন তুমি এতটা অপদার্থ মনে কর, ললিত, তখন বলা অনাবশ্যক যে, অন্যায় কাজে ছেলেদের উৎসাহ না দিয়ে, ঠিক তার বিপরীত কাজই আমি করে থাকি। কি তার অপরাধ একথা জান্‌তে

চেয়ে এমন কি আমার্জ্জনীয় অপরাধ করেছিল চারু, যার জন্য তাকে এমন নির্য্যাতন ভোগ করতে হবে।"

"নির্য্যাতন ! পিতা পুত্রকে শাসন করবেন—তাকে তুমি নির্য্যাতন বল, সতীশ ? ছেলেদের এই রকম সুশিক্ষাই দিয়ে থাকত"—বলিয়া মুখ টিপিয়া ললিত হাসিল।

তাহার কথার ভঙ্গীতে একটু উষ্ণ হইয়া সতীশ বলিল—"ছেলেদের আমি কি রকম শিক্ষা দিয়ে থাকি অন্তর্য্যামীই তা জানেন ; কিন্তু শিক্ষার নামে তোমরা যে অবিচার অবাধে চালাচ্ছ, একদিন তার ফল ভুগতে হবে না ? পিতা পুত্রকে শাসন করবে না, এমন কথা খুব বড় পাষণ্ডও মুখ ফুটে বলতে পারে না ; কিন্তু পিতার উদ্যত হস্ত যদি স্নেহাশীষ বর্ষণ না করে কেবলি বেত্রাঘাতে নিযুক্ত থাকে, তা'হলে সে শাসন যে বিষম দুঃসহ হয়ে উঠে, ললিত ! যখন তখন বাড়ী হতে দূর করে দেবার কথা বলে, চারুর পিতা তাহার কোমল হৃদয়ে যে নির্ম্মম আঘাত করে থাকেন, তা কি কোনরূপ দাগ না রেখে অন্তরেই বিলীন হয়ে যেতে পারে ? শাসন যেখানে স্নেহসিক্ত হয় না, সেখানে শাসন অমান্য করবার প্রবৃত্তি স্বভাবতই প্রবল হয়ে ওঠে। পিতার সত্যিকার আসন সেখানে কখনই নয় ললিত, যেখানে বসে তাঁকে কেবলই শাসনদণ্ড পরিচালন করতে হবে। ছেলেদেরও হৃদয় বলে একটা জিনিষ আছে। সেটাকে উপেক্ষা করে শুধু যে আমরা তাদেরই ক্ষতি করচি, তা নয়,—সঙ্গে সঙ্গে দেশের এবং সমাজেরও সর্ব্বনাশ করচি।"

"তোমার এই সব কেতাবী বুলি আমরাও যে কিছু জানিনা, তা' নয়। এসব বাজে কথা শুনবার অবসর আমার নেই—আর প্রয়োজনও কিছু দেখচিনে তার। তবে শেষবার তোমায় বলে যাচ্ছি, সতীশ

একটু সাম্‌লে চলাই ছিল ভাল।" ললিত আর বিলম্ব না করিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

সতীশ সেইখানেই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, শিক্ষাভিমানী দাম্ভিক এই সব লোকই সমাজের আদর্শ! শুধু বাহিরের আবরণ দেখিয়াই ইহারা সকল বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হয়—ভুলিয়াও কখনো ভিতরের দিকটা চাহিয়া দেখে না। এমনই সব লোক শিক্ষক, দেশের মানুষ তৈরী করিবার ভার এদেরই উপর ন্যস্ত!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[১]

সারাদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে। মহেশপুরের কাঁচা রাস্তায় হাঁটু অবধি কাদা জমিয়া উঠিয়াছে। ময়লা ধোয়া ঘোলা জল পুকুরগুলিকে কাণায় কাণায় পূর্ণ বিষপাত্রের মতই অস্পৃশ্য করিয়া তুলিয়াছে।

আজ হাটের দিন। দরিদ্র কৃষক নুনভাত খাইয়া দুটো পয়সা রাখিয়া দিয়াছিল—আশা ছিল, হাটে গিয়ে একান্ত আবশ্যকীয় দু' চারটী জিনিষ কিনিয়া অভাব পূর্ণ করিবে; কিন্তু এ দুর্য্যোগে আজ কিছুতেই হাট মিলিবে না। আরো সাতটা দিন তাদের তেলের অভাবে আঁধারেই রাত কাটাইতে হবে, খাবার সময় হয়ত নুনটুকুও জুটিবে না?

গোবর্দ্ধন দত্ত তাহার বাস্তুভিটা জমিদারের গ্রাস হইতে বাঁচাইবার চেষ্টায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া অবশেষে হেমেন্দ্রলালের বিলাস-ভবনের জন্য বাড়ীর অর্দ্ধাংশ ছাড়িয়া দিয়া স্ত্রী পুত্র লইয়া কোনমতে জীর্ণ একখানি কুঁড়ে ঘরে বাস করিতেছিল। মাইনর অবধি পড়িয়া পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী এক পাটের আফিসে সে কাজ করিত। ছেলের অসুখের জন্য কাল সে কাজে যাইতে পারে নাই—ফলে রাত্রিকালে তাদের এক রকম অনাহারেই থাকিতে হয়। জ্বর বিরাম পাইলে ছেলেটী যখন ক্ষুধায় কাতর হইয়া কাঁদিতে লাগিল, তখন চেষ্টা করিয়া চোখের জল চাপিয়া রাখিয়া গোবর্দ্ধন তাহার মুখে একটু একটু জল দিয়া শান্ত করিয়া রাখিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল ভোরে উঠিয়াই কাজে বাহির হইবে, কিন্তু দুর্য্যোগের সঙ্গে সঙ্গে ছেলের জ্বর আবার প্রবল হইয়া উঠিল, কাজে বাহির হওয়া আর সম্ভবপর হইল না।

প্রাণ প্রতিষ্ঠা

ছিন্ন-মলিন কন্থায় শায়িত রুগ্ন পুত্রের পাশে বসিয়া গোবৰ্দ্ধন যখন নিজের দুর্দ্দশার কথা ভাবিতেছিল, তখন হেমেন্দ্রলালের বিলাস ভবন হইতে তরল হাসির সঙ্গে সঙ্গীতের সুর ভাসিয়া আসিয়া তাহার কাণে যেন বিষ ঢালিয়া দিল। গোবৰ্দ্ধনের সমস্ত শরীর দিয়া যেন একটা বৈদ্যুতিক-প্রবাহ বহিয়া গিয়া তাহার মস্তিষ্কে আঘাত করিল। মর্ম্মন্তুদ যাতনায় একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া সে বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল। আতঙ্কে শিশু কাঁদিয়া উঠিল। গোবৰ্দ্ধনের হস্ত মুষ্টি-বদ্ধ হইল। ঘৃণিত নয়নে সে একবার আকাশের পানে চাহিল—কিন্তু সেখানেও কাল কাল মেঘমালার উদ্দাম নৃত্যভঙ্গি, আর বিদ্যুতের মর্ম্মভেদী নিষ্ঠুর অট্টহাসি! করুণার লেশমাত্র নিদর্শন কোথাও নেই—চারি দিকে শুধু তাচ্ছিল্য ও অপমান, পেষণ ও নির্য্যাতন!

উন্মত্তের ন্যায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া সে একেবারে হেমেন্দ্রলালের বিলাস-ভবনে গিয়া উপস্থিত হইল তাহার সিক্ত মলিন কাপড়, এক হাঁটু কাদা, আর বিকট ভ্রূভঙ্গি দেখিয়া হেমেন্দ্রলালের উষ্ণ-রক্ত ফুটিয়া উঠিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"কোই হ্যায়।" মোসাহেবের দল সঙ্গীত চর্চ্চা স্থগিত রাখিয়া গোবৰ্দ্ধনের দিকে পলকবিহীন নেত্রে চাহিয়া রহিল।

সেলাম ঠুকিয়া দরোয়ানজী আসিয়া কাছে দাঁড়াইতেই হেমেন্দ্রলাল গর্জ্জিয়া উঠিল—"হতভাগা! একে ঢুকতে দিয়েচ কেন?—ঘাড় ধরে এখনি বার করে দাও।"

গোবৰ্দ্ধন দেওয়ালে হাত দিয়া দাঁড়াইয়াছিল, উত্তেজনায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল, চক্ষু দিয়া আগুনের ফুল্‌কি বাহির হইতেছিল। দরোয়ান হাঁকিল—"আবি নিকালো।" গোবৰ্দ্ধন পদমাত্রও নড়িল না। আটা ও ঘীর বরাদ্দ বজায় রাখিবার জন্য দরোয়ান গোবৰ্দ্ধনের স্কন্ধে

হস্ত-স্থাপন করিল। গোবর্দ্ধন পাল্টা অর্দ্ধচন্দ্র প্রয়োগে তাহাকে বাহিরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া ভোজপুরী বীর সিঁড়ির উপর পড়িয়া গেল। তাহার নাক দিয়া রক্ত ছুটিল। "ডাকু, ডাকু হায়—" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে সাহায্যের আশায় সে জমিদারের ভবনে ছুটিয়া গেল।

"বসে বসে দেখ্‌চ কি সব?" বলিয়া হেমেন্দ্রলাল সঙ্গীদের পানে চাহিল। কিন্তু তাহাদের সকলকে আড়ষ্টভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া সে বলিল—"আজ তোকে রীতিমত শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছি।" হেমেন্দ্র পাদুকা উন্মোচন করিয়া গোবর্দ্ধনকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। গোবর্দ্ধন বজ্রমুষ্টিতে জমিদার-তনয়ের নবনীত কোমল হাতখানি চাপিয়া ধরিল। হেমেন্দ্র-লালের সুন্দর মুখখানি শবের মত শাদা হইয়া গেল।

দলবল সহ দরোয়ান ফিরিয়া আসিয়া পেছন হইতে গোবর্দ্ধনকে বাঁধিয়া ফেলিল, কিন্তু তবু সে হেমেন্দ্রলালের হাত ছাড়িল না; আজ সে এই দাম্ভিক অত্যাচারী জমিদারের হাতের হাড় গুঁড়া করিয়া পিষিয়া ফেলিবে! সকলে মিলিয়া অনেক চেষ্টা করিয়া গোবর্দ্ধনের হাত হইতে প্রভুকে মুক্ত করিয়া লইল।

তখনই থানায় এজাহার দেওয়া হইল। জোর করিয়া বাড়ী ঢুকিয়া মারপিট এবং জমিদারকে হত্যা করিবার চেষ্টা প্রভৃতি গুরুতর চার্জ্জ আনিয়া দারোগা বাবু সন্ধ্যার পর জমিদার ভবনে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া গোবর্দ্ধনকে চালান দিলেন।

এই ঘটনার পর আর আমোদ ভাল জমিল না। হেমেন্দ্রলাল একটা সোফার উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে—তাহার হাতটা বেদনায় কন্ কন্ করিতেছে। একটা গ্লাসে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি ঢালিয়া

আনিয়া একজন মোসাহেব কহিল—"এটা খেয়ে ফেলুন, চাঙ্গা হয়ে উঠ্‌বেন এখন।"

গ্লাসটি খালি করিয়া উঠিয়া বসিয়া হেমেন্দ্র কহিল—"কি স্পর্দ্ধা হয়েচে এই সব ছোট লোকদের!"

সুযোগ পাইয়া সঙ্গীগণ পোঁ ধরিল—"আমরা ত দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছিলুম; নইলে—"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া পায়চারি করিতে করিতে হেমেন্দ্রলাল পুনরায় বলিল—"এর পুরো দাম আদায় করে তবে আমি ছাড়ব।"

পারিষদ্‌দের মাঝে ভবেন্দ্রনাথ সবচেয়ে চতুর ছিল। সে কহিল—"দেখুন, একটা কাজ করা খুবই দরকার। একখানা ডাক্তারের সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে রাখা চাই। মোকদ্দমায় কাজে লাগবে।"

হেমেন্দ্র বলিল—"ঠিক বলেচ তুমি। নলিন ডাক্তারের কাছে এখুনি লোক পাঠাও।"

হাতুড়ে হইলেও নলিন ডাক্তারের মহেশপুর গ্রামে বেশ খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল। জমিদার বাটীর কাহারও অসুখ হইলে সাধারণতঃ পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী সহর হইতেই ডাক্তার আনা হয়, কেবল মামলা-মোকদ্দমার সাক্ষ্য দিবার জন্য নলিন ডাক্তারের ডাক পড়ে। জমিদারের কাজে নলিন কখনো ভিজিট গ্রহণ করে না। বাবুদের নিমন্ত্রণে প্রসাদ ও আমোদ-প্রমোদে যোগদান করিবার অনুমতি পাইলেই সে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে। সন্ধ্যার পর দারোগাবাবুর নিমন্ত্রণোপলক্ষে আজ বিশেষ কিছু আমোদের আয়োজন হইবে শুনিয়া নলিন ডাক্তার বিলম্ব না করিয়া জমিদার-ভবনে উপস্থিত হইল। হেমেন্দ্রলালের হাত বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া গম্ভীরভাবে কহিল—"আঘাত গুরুতর।"

প্রাণ-প্রতিষ্ঠা

সন্ধ্যার পরও মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। হাজতে অন্ধকারে বসিয়া গোবর্দ্ধন মনে মনে আজকার ঘটনা গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত আলোচনা করিতেছিল। আজ যাহা সে করিয়া বসিয়াছে, তাহা শুধু মুহূর্ত্তের উত্তেজনা বা দারিদ্র্যের কঠোর পেষণের আকস্মিক ফল নহে—ক্রমাগত নির্য্যাতনের জমাটবাঁধা বেদনা বুকের মাঝে গোপন থাকিতে না পারিয়া আজ উষ্ণ প্রস্রবণে পরিণত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে মাত্র। একা সে ইহার জন্য কখনো দায়ী নয়, কিন্তু বিচারের নির্ম্মদণ্ড প্রচণ্ড বজ্রের মত তাহারই মাথায় আসিয়া পড়িবে মনে করিয়া—নিজের জন্য নহে—অনশনে অসহায় অবস্থায় যাহাদের সে রাখিয়া আসিয়াছে, তাহাদেরই চিন্তায় তাহার চিত্ত অবশ হইয়া পড়িল।

সে দেখিয়া আসিয়াছে যে ঘরে কণামাত্র খাদ্য নাই—পথ্যের অভাবে রুগ্নপুত্রের মুখে সে শুধু জলবিন্দু দান করিয়াছে! আজ সমস্ত দিন তাহাদের কি ভাবে কাটিয়াছে একমাত্র অন্তর্য্যামিই তা জানেন। সে চিন্তা মনে আনিতেও গোবর্দ্ধনের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতেছে।

শিক্ষিত যাঁরা, উন্নত যাঁরা—চিরকাল ধরিয়া তাঁহারা বলিয়া আসিয়াছেন যে, দরিদ্রের স্নেহমমতা থাকিতে নাই, ঘুঁটেকুড়ুনীর ছেলেকে বড় হইবার চেষ্টা করিতে নাই। প্রকৃত পক্ষে হইয়াছেও তাহাই। সে ত পাষাণের মতই কঠিন—মরুভূমির মতই শুষ্ক হইয়া গিয়াছে; নইলে ক্ষুধার্ত্ত পুত্রের মুখে শুধু জলবিন্দু দিয়া অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিতে সে কি পারিত!

তাহার দু'গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িল। সে নিঃস্ব, দরিদ্র—হৃদয়দেবতার উদ্দেশে দান করিবার মত এমন পবিত্র জিনিষ আর তার নাই।

পেটা ঘড়িতে বারটা বাজিল।

শরীরের প্রতি মাংসখণ্ডে সূচের মতই আসিয়া বিঁধিল। বিস্মৃতির কোলে শান্তিলাভের আশায় দুবাহু মেলিয়া সে মেজের উপর লুটাইয়া পড়িল।

হেমেন্দ্রলালের বিলাস ভবনের উজ্জ্বল আলোকিত কক্ষে তখনো পূর্ণমাত্রায় আমোদ চলিতেছে।

[২]

লোকের মুখে গোবর্দ্ধনের স্ত্রী মালতী শুনিতে পাইল যে, পুলিশ তাহার স্বামীকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। খবর দিতে যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা মৌখিক সহানুভূতি দেখাইয়া একে একে সরিয়া পড়িল। মালতী চারিদিকে অন্ধকার দেখিল। ঘরে এমন কিছুই নাই যাহার বিনিময়ে সে স্বামীর মুক্তি ক্রয় করিতে পারে।

স্বামী কোন গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন, এ কথা সে কোন মতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। বিশ বৎসরকাল একসঙ্গেই তাহারা সুখ-দুঃখের সকল অংশ সমানে ভাগ করিয়া লইয়াছে। অভাবে, অনশনে, সময় সময় বিচলিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু বিপথে কখনো যায় নাই। শরীর পাত করিয়া কোন প্রকারে তাহারা নিজেদের জীবন-তরণী বাহিয়া লইতেছিল, কিন্তু সহসা আজ বিপদের সিন্ধু উথলিয়া উঠিয়া প্রবল-প্লাবনে তাহাদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে!

স্বামী পুলিসের কবলে, পুত্র রুগ্ন, গৃহে কণামাত্র খাদ্য নাই, একা অসহায়া সে! মালতী মনে করিল, পরিত্রাণের আর কোন উপায় নাই।

নিরপরাধ জানিয়া পুলিশ তাহার স্বামীকে ছাড়িয়াও দিতে পারে এই আশায় সমস্ত রাত সে উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়াছিল, কিন্তু রাত্রিশেষে ক্লান্তিবশতঃ দরজার কাছেই মাটীর উপর ঢলিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। পুত্রের

ক্রন্দনে চমকিয়া উঠিয়া সে চাহিয়া দেখিল যে, রোদে আঙিনা ভরিয়া গিয়াছে।

স্বামীর আগমনের কোন চিহ্ন না দেখিয়া মালতীর বুকের ভিতরটা যেন একেবারে খালি হইয়া গেল। আশায় আশায় সমস্ত দিন কাটিয়া গেল, তবু স্বামী গৃহে ফিরিলেন না। মালতী আর স্থির থাকিতে পারিল না। কিন্তু, কি-ই বা সে করিবে? মালতী একা কখনো গ্রামের রাস্তায় বাহির হয় নাই। যদি একবার সে বাছের সর্দ্দারকে সংবাদ দিতে পারিত, তাহা হইলে সহস্র কাজ ফেলিয়াও বাছের সহরে গিয়া তাহার স্বামীকে মুক্ত করিয়া আনিত।

এক বাছের সর্দ্দার ব্যতীত সমগ্র মহেশপুর গ্রামে গোবর্দ্ধনের হিতৈষী আর কেহ নাই। জমিদারের বিষ নজরে পড়িবার ভয়ে গোবর্দ্ধনের সঙ্গে মৌখিক আলাপ করিতেও কেহ সাহস পাইত না। গ্রামশুদ্ধ লোক এমনই অপদার্থ হইয়া গিয়াছে!

আর কি-ই বা অপরাধ তাদের? মালতী নিজেইত জানে যে, অভাবের তাড়নায় যাহারা জমিদারের নিকট হইতে একবার ঋণগ্রহণ করিয়াছে—যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়াও আর তাহারা ঋণমুক্ত হইতে পারে নাই। তারপর, যে-সে কারণে, যখন তখন ধর-পাকড়, মার-পিট ত আছেই। এমন কঠোর পেষণে মানুষ কেমন করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে?

বিপন্মুক্তির কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া মালতী স্থাণুর মত বসিয়া রহিল। দুর্ভাবনার পসরা পূর্ণ করিয়া অসহ্য বেদনায় তাহাকে আরো ক্লিষ্ট করিয়া ফেলিল—যখন, "খেতে দে মা" বলিয়া শিশুপুত্র মাতৃঅঞ্চলে মুখ লুকাইল। পুত্রকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া সে গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

প্রাণ-প্রতিষ্ঠা

একদিন নয়, দুদিন নয় ; মাসের পর মাস প্রত্যহ কি কদর্য্য অন্ন সে নিজহাতে স্বামীকে পরিবেশন করিয়াছে। একটি দিনের তরেও ত স্বামীর ললাট হইতে দুর্ভাবনার চিন্তারেখা সে দূর করিতে পারে নাই— পুত্রের মুখে কণামাত্র সুখাদ্য তুলিয়া দিতে সক্ষম হয় নাই ! তাহার সমস্ত জীবনইত একরূপ বিফলে গিয়াছে।

মালতী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নিজের দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করিতেছে, এমনই সময় শুষ্ক মুখে বাছের সর্দ্দার আসিয়া বারান্দায় বসিয়া পড়িল। এই মাত্র সে শহর হইতে ফিরিতেছে। জমিদারের ষড়যন্ত্রে আইনের নাগপাশ এমন করিয়াই গোবর্দ্ধনকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল যে, অনেক চেষ্টা করিয়াও বাছের তাহাকে মুক্ত করিতে পারে নাই। বিদায় কালে গোবর্দ্ধন পিতৃবন্ধু এই মুসলমান সর্দ্দারের হাত দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলিয়াছিল—"বাছের, যাদের রেখে গেলাম, দেখো যেন দু'মুঠো ভাতের অভাবে তারা না মরে।" বাছের তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এ সব কথা সে মালতীকে কেমন করিয়া বলিবে, কি বলিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিবে ?

অনেক চেষ্টা করিয়া বাছের ধীরে ধীরে মালতীকে সবই বলিল। মালতী আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল—তাহার আর কথাটি কহিবার শক্তি নাই। তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বাছের কহিল—"উতলা হয়োনা, তুমি। একটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। কিন্তু এখানে একলাটি কিছু তুমি থাকতে পারবে না। একটু সুস্থ হয়ে নাও, আমি আজই তোমায় বাপের বাড়ী রেখে আসি।"

মালতী কহিল—"না, সর্দ্দার, এ বাড়ী ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। দু'বেলা ভিখ্ মেগে খাব, তবুও এ ভিটে ছেড়ে যাব না।"

"বিপদের সময় অমন ছেলে মানুষী করিসনে বেটি ! খাবার কথা

বল্‌ছিস কি ! বাছের কি তার মেয়েকে দু'মুঠো খেতে দিতে পারে না ? আসল কথা তা নয়রে, মেয়ে, বুঝিস ত সবই তুই ! এ গাঁয়ে, এই কাঁচা বয়সে একা কি কেউ থাকতে পারে ? একটা বছর ভালোয় ভালোয় কাটিয়ে দিতে পারলে, সব দুঃখই ঘুচবে। আর অমত করিস্‌নে। জিনিষপত্তর যা কিছু আছে, গুছিয়ে নে, আমি তোদের খাবার নিয়ে আসি।"

বাছের খাবার আনিতে চলিয়া গেল। মালতী বুকের মাঝে আগুনের জ্বালা লইয়া তেমনই বসিয়া রহিল।

"বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে" বলিয়া পুত্র পুনরায় কাঁদিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। মালতী চাহিয়া দেখিল। রক্তমাংসের শরীর লইয়া সে কত আর সহিবে ? সকল জ্বালা যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য আজ তাহার নিপীড়িত চিত্ত ব্যাকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু উপায় নাই—আত্মহত্যা ব্যতীত পরিত্রাণের উপায় নাই ! ইচ্ছা করিলে এই মুহূর্ত্তেই সে সব শেষ করিতে পারে,—প্রয়োজন শুধু একখণ্ড রজ্জু।

তাহার শিরায় শিরায় আগুনের কণা ছুটিয়া চলিয়াছে, নিজেকে সামলাইবার মত শক্তি তাহার নাই। দুঃখপূর্ণ জীবনের বিনিময়ে মৃত্যুর ক্রোড়ে অনন্ত শান্তি ! সে প্রলোভন জয় করা আজ তাহার পক্ষে বড়ই দুরূহ। মাতালের মত টলিতে টলিতে সে একখণ্ড দৃঢ় রজ্জু সংগ্রহ করিল। এইত উপযুক্ত সময় !—স্বামী কারারুদ্ধ, পুত্র— ! তড়িৎস্পৃষ্টের মত অসাড় হইয়া সে পুত্রের শীর্ণ মলিন মুখপানে চাহিয়া রহিল। অজ্ঞাতসারে তাহার হস্ত হইতে বন্ধনরজ্জু খসিয়া পড়িল। ছুটিয়া গিয়া পুত্রকে বুকে জড়াইয়া সে দ্রুতপদবিক্ষেপে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ক্রমাগত ব্যভিচারের ফলে হেমেন্দ্রলালের শরীর একেবারে ভাঙিয়া গেল। প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়া সে শয্যা গ্রহণ করিল। খবর পাইয়া কমলাকে লইয়া সতীশ সেখানে উপস্থিত হইল। বধূকে দেখিয়া হেমেন্দ্রলালের জননী কাঁদিয়া কহিলেন—"কেন তোমায় পাঠিয়েছিলুম, মা! তুমি এখানে থাকলে হয়ত এতটা হতো না!"

সতীশ ও কমলা দিনরাত সমানে রোগীর শুশ্রূষা করিতে লাগিল। বিকারের ঘোরে হেমেন্দ্রলাল যখন প্রলাপ বকিত, রোগের যাতনায় যখন সে অধীর হইয়া কাঁদিয়া উঠিত, কমলা তখন নিজেকে কিছুতেই সামলাইতে পারিত না, নিঃশব্দে শয্যার পার্শ্বেই উপুড় হইয়া পড়িয়া থাকিত।

দশদিন পরে ডাক্তার অভয় দিয়া বলিলেন যে রোগীর জীবনের আর আশঙ্কা নাই। কমলার বুকের উপর হইতে যেন একটা পর্ব্বতের বোঝা নামিয়া গেল।

সে দিন হেমেন্দ্রলালের জ্বর সম্পূর্ণ বিরাম পাইয়াছে। সতীশ পাশের একটা ঘরে বিশ্রাম করিতেছিল, কমলা একা নিদ্রিত স্বামীর পাশে বসিয়াছিল। হেমেন্দ্রলাল জাগিয়া কমলাকে দেখিতে পাইয়াই মুখ ফিরাইয়া লইল। কমলা কোন কথা কহিল না, যেমন ছিল তেমনই বসিয়া রহিল। হেমেন্দ্র আবার পাশ ফিরিয়া শুইল; চোখ বুজিয়াই কহিল—"তুমি কেন এয়েচ?" প্রশ্নটা যেন তীরের ফলার মতই কমলার বুকে বিঁধিল, কিন্তু তবু সে কোন কথা কহিল না।

হেমেন্দ্র আবার জিজ্ঞাসা করিল—"লেকচার দেওয়া ভুলে গেছ?"

বিবাহের অল্প কদিন পরেই কমলা স্বামীকে কুসঙ্গীদের বিদায় দিতে অনুরোধ করিয়াছিল। সেই দিন হইতেই কোন কথা বলিলেই তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া হেমেন্দ্র বলিত "লেকচার দিয়ে আমায় শোধরাবার চেষ্টা নাই বা করলে!" আজ এতদিন পরে এমন অবস্থায় স্বামীকে আবার সেই কথা বলিতে শুনিয়া কমলা বেদনায় আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল।

জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের জবাব না পাইয়া হেমেন্দ্রলাল একবার পত্নীর মুখের দিকে চাহিল। শ্যামপত্রের অন্তরালে শিশির-সিক্ত পুষ্পকোরকের মত নীলাম্বরীর অবগুণ্ঠনতলে কমলার অশ্রুপ্লাবিত মুখখানি দেখিয়া মুগ্ধনয়নে সে চাহিয়া রহিল। এমন ত কখনো সে দেখে নাই! চোখের পলক না ফেলিয়া হেমেন্দ্র পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়াই রহিল। তার পর ধীরে ধীরে কমলার একখানি হাত টানিয়া লইয়া কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব কোমল করিয়া কহিল—"রাগ করেচ, কমল?"

কমলা তবুও কথা কহিল না, ফুলিয়া ফুলিয়া খালি কাঁদিতেই লাগিল।

হেমেন্দ্র সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে সতীশ একদিন ভগ্নীর নিকট বিদায় লইয়া গৃহে ফিরিয়া চলিল। যতক্ষণ দেখা যায়, কমলা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া দাদাকে দেখিতে লাগিল, তারপর নদীর বাঁকে নৌকা যখন অদৃশ্য হইয়া গেল, তখন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কমলা সরিয়া দাঁড়াইল। দুঃখে কষ্টে বেদনায় সতীশের মত স্নেহের আবরণে ঢাকিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য এখানে আর কে রহিল! জ্বালা যখনই বড় দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে, তখনই সতীশ তার অন্তরের স্নেহের প্রলেপে শীতল করিয়া দিয়াছে, তাহার হতাশে-আঁধার মনের কোণে আশার প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়াছে—ভাঙা বুকে আঘাত সহিবার শক্তি সঞ্চারিত

করিয়াছে। আজ যাহার আশ্রয়ে রাখিয়া দাদা চলিয়া গেল, সে কি এমন করিয়াই তার দুঃখ বেদনা দূর করিবার চেষ্টা করিবে? কমলা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই সব ভাবিতেছিল।

হেমেন্দ্র ঘরে ঢুকিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"মুখ খানি অমন ভার করে একলাটি দাঁড়িয়ে রয়েচ কেন, কমল?"

"দাদা চলে গেল।"

"তার জন্য এতই যদি দুঃখ, তবে সঙ্গে গেলেই পার্‌তে। সত্যি কথা বলতে কি, তোমার দাদা চলে গেছেন বলে আমি যেন মুক্তির নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছি। বাপরে কি কঠিন লোক!"

কমলার সব চেয়ে বড় দুঃখ এই যে, স্বামী তাহার দাদাকে চিনিল না। কিন্তু তার কথার প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা তাহার আর নাই। সে জানে কথা কহিলেই শ্লেষের নির্ম্মম কষাঘাত করিতে স্বামী কুণ্ঠিত হইবে না।

হেমেন্দ্র কহিল—"অমন প্যাঁচার মত মুখ করে থাকলে চলবে না। চল, আমার নতুন বন্ধুদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই।"

আবার সেই সমস্যা। এই তার স্বামী! ঘৃণ্য জঘন্য চরিত্রের কতকগুলি লোকের সামনে নিজের পত্নীকে লইয়া যাইবার আগ্রহ কিছুতেই তাহার কমিবে না। কমলা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না স্বামী তার কাছে কি চায়?

"চুপ করে রইলে যে, তারা যে বসে রয়েচে।"

কমলা কহিল—"আমি যাব না।"

"কেন যাবে না?"

একটা শক্ত জবাব কমলার মুখ দিয়া বাহির হইতেছিল কিন্তু অপ্রীতি বাড়িবার ভয়ে তাহা চাপিয়া সে কহিল—"মাকে বল গে, তাঁর মত হলেই যাব।"

"মায়ের কাছে বলতে গেলুম কেন? আমার কি এতটুকু অধিকার নেই?"

"না, কাউকে অপমান করবার অধিকার কোন মানুষেরই নেই। বলিয়া কমলা দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

হেমেন্দ্র উত্তেজিত হইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল—তোমাকে যেতেই হবে—আমি জোর করে তোমায় নিয়ে যাব।" কিন্তু সে বল প্রয়োগ করিতে পারিল না। কমলার সেই ঢলঢল মুখশ্রী আহত সম্মানে ও চরিত্রের দৃঢ়তায় এমন এক নূতন ভাব ধারণ করিয়াছে যা দেখিয়া হেমেন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া গেল।

নারী খেলার পুতুল, বিলাসের সামগ্রী, পুরুষের ভোগ-বাসনা মিটাইবার জন্যই সংসারে আসিয়াছে, যৌবনের কু-শিক্ষার ফলে এমনই বিকৃত একটা ধারণা তাহার ছিল। নীচ প্রকৃতির সঙ্গীদের সহিত মিশিয়া লালসা-পূর্ণ নয়নেই কেবল সে নারীর মুখের দিকে চাহিয়াছে—ভাবিবার অবকাশ কখনো পায়নি যে, নারী শুধু মানবী নয়, নারী দেবীও বটে।

হেমেন্দ্র পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মাঝে মাঝে তাহার মনে হইত খুব কড়া শাসনে সে কমলাকে বশ করিবে, ভালো করিয়াই তাহাকে বুঝাইয়া দিবে যে, স্বামীর আদেশ পালন না করিলে স্ত্রীর জীবন কেমন দুর্ব্বহ হইয়া ওঠে। তাহার কেবলি মনে হইত যে তাহার স্বামীত্বের অধিকার দিনে দিনে ক্ষুন্ন হইতেছে। এই সব ধারণা মগজে গজাইয়া যখন তাহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিত তখনই কঠোর শাসনে সে কমলাকে পীড়ন করিত। পুরুষ হইয়া কখনো সে নারীর কাছে পরাজয় মানিয়া লইবে না—বিশেষত সে নারী যখন তাহার স্ত্রী, শাস্ত্রের বিধানে তাহারই দাসী।

হেমেন্দ্র কহিল—“শোন কমল, শেষবার তোমায় বল্‌চি, আমার কথা মত কাজ কর।”

স্বামীর কাছে সরিয়া আসিয়া কমল কহিল—“আমায় ভুল বুঝ না। তোমার কথা ঠেলে তোমায় ব্যথা দেবার ইচ্ছে আমার মোটেই নেই। তোমার সকল আদেশ আমি বিনা ওজরে পালন করব, কেবল অন্যায় অসঙ্গত কিছু করতে আমায় বলো না।

কথা শুনিয়া হেমেন্দ্র আবার উত্তেজিত হইয়া উঠিল, কিন্তু স্ত্রীকে কিছু না বলিয়া ঘর থেকে বাহির হইয়া গেল।

কমলা দেখিল স্বামী প্রমোদ-ভবনের দিকে চলিয়াছে, একটিবার তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না! ধীরে ধীরে অবসন্ন দেহটাকে টানিয়া লইয়া সে একটা জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

মায়ের স্নেহ বুকে লইয়া কমলার শাশুড়ী পিছন হইতে আসিয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া বেদনা-কাতর কণ্ঠে কহিলেন—“আবার বুঝি রাগ করে চলে গেছে?”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জেলের কঠোরতা গোবর্দ্ধনকে এতটুকুও বিচলিত করিতে পারিত না। ছেলেবেলা থেকে শারীরিক শ্রমে সে অভ্যস্ত, দুঃখ-কষ্টের অনেক ঘোড় খাইয়া তাহার দেহ-মন গড়িয়া উঠিয়াছে। জেলের পীড়ন তাই সে অবিচলিত চিত্তে সহিতে পারিত, কিন্তু কাজের অবসানে রুদ্ধ ঘরের আঁধার কোণে যখন জেলের দেওয়া কম্বলখানি পাতিয়া তাহার উপর পড়িয়া থাকিত, তখন রুগ্ন-পুত্রের শীর্ণ মুখখানি আর অভাগী পত্নীর জল-ভরা চোখ যেন সে স্পষ্ট করিয়াই দেখিতে পাইত। ওই নিরীহ নিরপরাধ দুটি প্রাণীকে কেন সে দারিদ্র্যের মাঝে টানিয়া আনিয়াছিল? সে কেন বিবাহ করিয়াছিল!

সেই দিনও গোবর্দ্ধন জানালার কাছে বসিয়া স্ত্রী-পুত্রের চিন্তায় মগ্ন ছিল। বৃদ্ধ কয়েদী ভৈরব দাস ধীরে ধীরে তাহার কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে কহিল— 'রোজ রোজ অত করে কি ভাব ভাই?"

গোবর্দ্ধন কিছুকাল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিল—"তোমার কোন অসুবিধা হয় তাতে?"

"কয়েদীর কিসে অসুবিধা ভাই? আমি বলচি, মিছে ভেবে ভেবে শরীরটা মাটি কর কেন? খুন-খারাপি কিছু করেছিলে?"

গোবর্দ্ধন বলিল—"তুমি আমায় রেহাই দাও, আমি মিনতি করে বলছি আমায় একা থাকতে দাও।"

ভৈরবদাস গোবর্দ্ধনের আরো কাছে সরিয়া বসিল। তারপর ধীরে ধীরে কহিল—"তোমার অবস্থা দেখে সত্যিই আমার বড় দুঃখ হয়েছে। আমায় যতটা বদ লোক মনে করে তুমি আমায় দূরে ঠেলতে চাচ্ছ,

সত্যি সত্যি তত বদলোক আমি নই। আমিও তোমারই মত ভদ্রলোক, চুরি বা ডাকাতি করবার অপরাধেও জেলে আসিনি। মনে যা অন্যায় বলে জেনেছি, তারই প্রতিরোধ করবার জন্য আমায় এখানে আসতে হয়েছে। আমি জানি তুমি নির্দ্দোষ তাই তোমার সঙ্গে পরিচিত হতে চাই।"

গোবর্দ্ধন এই বৃদ্ধের প্রতি যে অকারণে রূঢ় ব্যবহার করিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হইয়া কহিল,—"ক্ষমা কর ভাই। না জেনে তোমার মনে ব্যথা দিয়েছি, আমার আর মাথা ঠিক নেই। যদি জানতে আমি আমার স্ত্রী পুত্রকে কতবড় বিপদের মাঝে ফেলে এসেছি তা' হলে আমার ব্যবহারে তুমি বিস্মিত হতে না।"

"আর আমার কথা শুনবে, তুমি? ঋণের দায়ে ফকির হয়েছিলাম। স্ত্রীর অসুখ হলো, চিকিৎসা করাতে পারলুম না, বাঁচাবার চেষ্টায় এক ফোঁটা ওষুধও মুখে দিতে পারলাম না, সাতদিন ভুগে ভুগে সে মরে গেল! তারপর একটিমাত্র মেয়ের রোগ শয্যার পাশ থেকে জল্লাদের মত ছিনিয়ে এনে আমায় পাঁচ বচরের জন্যে এই নরকের মাঝে ফেলে দিয়ে গেছে। তোমার দুঃখের কথা কিছুই আমি জানিনে, কিন্তু বল্‌তে পার, এই বুড়ো বয়সে কিসের আশায় কোন সাহসে বুক বেঁধে আমি এখনও বেঁচে রয়েছি?" বলিতে বলিতে বৃদ্ধ বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিল।

গোবর্দ্ধন নিজের কথা ভুলিয়া গেল। দরিদ্রের অবস্থা সর্ব্বত্রই সমান! মানুষের উপর মানুষ প্রতিদিন এই যে অবিচার করিতেছে, অপরাধের শাস্তি দেবার ভার নিয়ে কত নিরপরাধ লোকের মাথায় যে বিচারক বাজ হানিতেছেন, ভুক্ত-ভোগীরা ছাড়া তাহার খবর দুনিয়ার কয়জন রাখে!

গোবর্দ্ধন ভাবিল, এম্নি উপেক্ষায় এম্নি সকলের অগোচরে নিত্য অবিচার সহ্য করিয়া তাহারই মত গরীব লোক আর তাদের ছেলে পুলেরা জীবন কাটাইয়া দিবে। একদিন সে একখানা বাংলা খবরের কাগজে দেখিয়াছিল, ইংরাজী লেখা পড়া জানা জন কত ছেলে আইন অমান্যের অপরাধে ধৃত হইয়াছিল বলিয়া দেশের বড় বড় লোক মহা আন্দোলন জুড়িয়া দিয়াছে।

গোবর্দ্ধন আর তার মত লোকেরা তো আইন অমান্য করিতে যায় নাই, সকলের অন্তরালে নিজেদের খাওয়া পরার একান্ত চেষ্টাতেই বিব্রত ছিল। আইনের নাগপাশ সেখান হইতেও তাহাদিগকে বাঁধিয়া আনিয়াছে—কিন্তু তাতে একটি লোকও তো একটি কথা বলে না! ইংরাজী শেখে নাই বলিয়াই কি তাহারা এতটা উপেক্ষার পাত্র?

গোবর্দ্ধনের চিন্তায় বাধা দিয়া ভৈরব দাস কহিল—"মিছে ভেবোনা ভাই। গরীব হয়ে যখন জন্মেছ, তখন সকল অবিচার অত্যাচার মুখ বুজেই সইতে হবে।"

গোবর্দ্ধন কহিল—"আর স্বীকার করতেই হবে যে দীনবন্ধু বলে কেউ একজন বসে বসে আমাদের শুধু মঙ্গলই করছেন।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বন্ধুদের সামনে যাইতে অস্বীকৃতা হওয়ায় কমলা স্বামীর অপ্রীতি-ভাজন হইয়াছে, এ কথা জানিয়া হেমেন্দ্রলালের জননী ছেলের বন্ধুদের ডাকিয়া বধূকে দেখাইয়াছেন। ঠিক মনের মতটি না হইলেও হেমেন্দ্রের রাগ ইহাতে অনেকটা পড়িয়া আসিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে কমলার উপর রাগ করিবার কোন সঙ্গত কারণই থাকিতে পারে না, তাহা হেমেন্দ্রলাল ভালো করিয়াই বুঝিয়াছিল। কিন্তু তবুও তাহার চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিত শুধু এই আশঙ্কায় যে, কমলার কথা মত কাজ করিলে বুঝি তাহার চরিত্রের দৌর্ব্বল্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে। স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া যে দিকেই হোক না কেন, সে ভাসিয়াই যাইতে চায় অথচ নিয়তই কমলা তাহাকে নিজেরই কাছে টানিয়া লইতেছে। এই আকর্ষণই তাহার উচ্ছৃঙ্খল চিত্তকে মাঝে মাঝে বন্ধন-বেদনায় ক্লিষ্ট করিয়া ফেলে।

সে যে কমলাকে চায় না, তাহা নয়। রূপ দেখিয়াই সে কমলার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু সংসারকে চিরদিনই সে ভয় পায়, তাই কেবল লালসার আগুন বুকে লইয়া যখনই কমলার কাছে গিয়া সে দেখিত যে, তাহার প্রবল ভোগবাসনার অন্তরায় স্বরূপ সংযম ও পবিত্রতার মূর্ত্তি লইয়া কমলা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তখনই জোর করিয়া তাহাকেই বশ করিবার প্রবৃত্তি তাহাকে পাইয়া বসিত।

সেদিন একখানা চিঠি হাতে করিয়া কমলা দাঁড়াইয়াছিল। হেমেন্দ্রলাল ঘরে ঢুকিয়া কহিল—"রাত দিন অমন হাঁড়ীর মত মুখ করে থাকলে এখানে থাকা পোষাবে না।'

থাকা যে পোষাইবে না তাহা কমলারও মাঝে মাঝে মনে হইত। নিজের বিবেকের সঙ্গে স্বামীর ব্যাভিচারের এই নিত্য সংঘর্ষ তাহার দেহ মন ভাঙিয়া দিয়াছে। মাঝে মাঝে তাহার মনে হইত, এখানকার সব কিছু শেষ করিয়া সে আবার পিত্রালয়ে ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু তাহা ভাবিতেও তাহার বুক যেন কেন বেদনায় ভরিয়া উঠিত। স্ত্রীর ন্যায্য অধিকার পাইবার চেষ্টা করিয়া বার বার সে প্রত্যাখ্যাতা হইয়াছে, পাওনার দাবী করিতে দাবী তো অপূর্ণই রহিয়া গিয়াছে অধিকন্তু বাড়িয়া উঠিয়াছে কেবল অপ্রীতি।

হেমেন্দ্রলাল জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েচে তোমার।"

"দাদার বিয়ে। তোমায় সঙ্গে নিয়ে যেতে লিখেছেন।

"সে হয় না। আমি গিয়ে যে তোমাদের বাড়ীর পবিত্রতা নষ্ট করব, তা হবে না। তুমি একাই যাও। ইচ্ছে হয়ত শিগগীর শিগ্গীর ফিরে এসো।"

এর পর শত অনুরোধেও যে স্বামীকে তাহার সঙ্গে যাইতে রাজী করানো যাইবে না, তাহা বুঝিয়া কমলা চুপ করিয়াই রহিল।

"তোমার যাবার বন্দোবস্ত আমি করে দিচ্ছি" বলিয়া হেমেন্দ্র ঘরের বাহিরে গেল। কর্ত্তব্যানুরোধে যে হেমেন্দ্র স্ত্রীকে পিত্রালয়ে পাঠাইতে চায়, তাহা মোটেও নয়। ক'টা দিন অন্ততঃ উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিবার জন্য সে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং কমলাকে পিত্রালয়ে যাইতেই হইল।

কমলাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়াই হেমেন্দ্রলাল বন্ধুদের ডাকিয়া একটা বড় রকম আমোদের আয়োজন করিতে বলিয়া দিল।

গৃহপালিত বুভুক্ষু কুকুর বহুদিন পরে প্রভুর এতটুকু আদর পাইলেই যেমন উল্লাসে লাফাইয়া উঠে, তেমনি হেমেন্দ্রলালের আহ্বানে

পারিষদ দল মাতিয়া উঠিল। মাথায় চাদর জড়াইয়া সেই রোদের মাঝেই দুইজন মোসাহেব সহরের দিকে ছুটিল।

পরিপূর্ণ একটা ফ্লাস্ক হইতে খানিকটা মদ পেটে ঢালিয়া হেমেন্দ্র একটা ফরাসী অর্গানের চাবি টিপিল, নবীন বন্ধু প্রেমতোষ গান ধরিল।

গানটি শুনিয়াই হেমেন্দ্রলালের মনে আর একটি দিনের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। সে দিন সন্ধ্যায় দোতলার ছাতের উপর কমলার পাশে সে দাঁড়াইয়াছিল। মেঘের আড়াল থেকে মাঝে মাঝে জ্যোৎস্না গলিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। নদীর উপর দিয়া নৌকারোহী এক অজ্ঞাত যাত্রী এই গানটিই গাহিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। রেলিংয়ে ভর দিয়া কমলা দাঁড়াইয়াছিল, তাহার মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল মেঘ-কাটা চাঁদের আলো। সেদিন কমলাকে কেমন নিবিড় ভাবে কত আপন করিয়াই পাইয়াছিল! সেদিনকার সেই ছবিখানি যেন হেমেন্দ্রলালের চোখের সামনে আবার ফুটিয়া উঠিল আর সঙ্গে সঙ্গে একটা বেদনার অনুভূতি, একটা অভাবের দৈন্য তাহার সমস্ত চিত্ত মথিত করিয়া তুলিল।

বিরক্তি প্রকাশ করিয়া সে প্রেমতোষকে বলিল—"গাধার মত চেঁচাচ্ছ কেন?

বিস্মিত পারিষদ গান থামাইয়া বাহিরে গেল। একজন সঙ্গীকে ডাকিয়া কহিল—"মেজাজ যে বড়ই কড়া দেখচি।"

"ধরা দিয়েচেন আর কি! এখন বসে বসে লাল টুকটুকে বউটির হাতের ছোলা খাবেন আর দিনরাত কপচাবেন।"

প্রেমতোষ কহিল—"আমাদের কি বাবা! আমরা বসন্তের কোকিল, গরম সইতে পারিনে। আমোদ যেখানে পাব, দুই ডানা মেলে

সেখানেই গিয়ে হাজির হব। কাল হতে আর এখানে থাকচিনে বাবা!"

"আমিও ভাই তোকে ছুঁয়ে বলচি, আর এখানে থাকা নয়। রায়পুরের বাবুরা সেখানে যাবার জন্যে কত করে আমায় লিখেচে। তাদের ওখানে কি ফূর্ত্তি ভাই, যেন গঙ্গার স্রোত।"

ঘরের মাঝে একা বসিয়া হেমেন্দ্র ভাবিতেছিল, কেন এমন হইল? আমোদের আয়োজন করিতে নিজেই সে বলিয়াছে। কিন্তু অন্তরের আনন্দ উৎস এমন করিয়া সহসা কেন শুকাইয়া গেল? আগের মত মনপ্রাণ ঢালিয়া সে তো আর আমোদ করিতে পারিতেছে না! আর সবই তো আগেকার মতই রহিয়াছে। সেই বন্ধুর দল, ফূর্ত্তিরও সেই একই উপকরণ, কিছুর তো অভাব নাই। তবুও কেন এই বিতৃষ্ণা?

হেমেন্দ্র ভাবিল কমলার কথা। তারই প্রভাব কি অলক্ষিতে তার মনের উপর কাজ করিতেছে? না, না, তাহা কখনো হইতে দিবে না—নিজেকে সে কিছুতেই ধরা দিবে না। সে চায় নিত্য নূতন আমোদ, কর্ত্তব্যের গণ্ডীর মাঝে আবদ্ধ থাকিয়া শুচিতার বর্ম্ম আঁটিয়া সে বাঁচিবে না।

হেমেন্দ্রলাল ফ্লাস্ক খুলিয়া আবার খানিকটা মদ খাইল। মনে মনে সঙ্কল্প করিল কমলাকে আর সে ঘরে আনিবে না, যেমন ছিল সে তেমনই পিত্রালয়ে পড়িয়া থাকিবে।

ক্রমে সুরার প্রতিক্রিয়া সুরু হইল। তাহার চিন্তার স্রোত আবার ভিন্ন দিকে ছুটিয়া চলিল। কমলাকে তার চাই-ই! নইলে সে বাঁচিবে না। মদের ফ্লাস্কটা দুহাতে ধরিয়া সে দেওয়ালের গায়ে ছুঁড়িয়া মারিল। তারপর টলিতে টলিতে প্রমোদ-ভবনের বাহিরে চলিয়া গেল।

সমস্ত শুনিয়া ভবেন্দ্রনাথ কহিল—"কিছু ভয় নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

হেমেন্দ্রলাল সারাটা দিন ঘরের বাহির হইল না। আজকার আমোদে যোগ দিবার স্পৃহা তাহার আর মোটেও নাই।

সন্ধ্যার সময় ভবেন্দ্র আসিয়া কহিল—"এবার চলুন, সব প্রস্তুত।"

"আমি আজ না-ই গেলুম ভবেন, শরীরটা ভালো নেই।"

ভবেন্দ্র জবাব দিল—"সারাদিন ঘরের মাঝে বসে থাকলে শরীর তো খারাপ হবেই! শরীরের সঙ্গে মনেরও একটা যোগ আছে—মনটাকে তাজা করে নিন, দেখবেন শরীরও চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।"

প্রমোদ-ভবনে তখন নূপুর গুঞ্জন ও বামাকণ্ঠের সুর ধ্বনিয়া উঠিয়াছে। রক্ত মাংসের গন্ধ পাইয়া শার্দ্দুল যেমন লাফাইয়া ওঠে, হেমেন্দ্রলালের লালসাও তেমনি অদম্য শক্তি লইয়া জাগিয়া উঠিল। বন্ধুর হাত ধরিয়া হেমেন্দ্র বিলাস-ভবনের দিকে অগ্রসর হইল।

সমস্ত রাত ব্যাভিচারে কাটিয়া গেল। পরদিন চক্ষু মেলিয়া চাইয়া হেমেন্দ্র দেখিল চারিদিক রোদে ভরিয়া গিয়াছে। মেজের পাতা গালিচার উপর তখনো যে ক'টি নরনারী অচেতন অবস্থায় পড়িয়াছিল, তাদের দিকে চাহিতেই তাহার সমস্তটা দেহ কাঁপিয়া উঠিল। কি কুৎসিত বীভৎসতা?

হেমেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিল। সারা রাত ধরিয়া একটা প্রকাণ্ড দানব যেন তাহার এই বিলাস-ঘরের সমস্ত জিনিষ ওলট-পালট করিয়া তার দানবী শক্তির পরিচয় দিয়াছে।

নিজের ঘরে ফিরিয়া হেমেন্দ্রলাল বিছানায় শুইয়া পড়িল। তাহার বুকের ভিতর যেন আজ আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এই আমোদ? স্ফুর্ত্তি এমনেই? কাল যাহা সে করিয়াছে, সে সব তো তাহার জীবনে

নতুন নয়! কত রাতইতো সে এমন করিয়াই কাটাইয়া দিয়াছে। কিন্তু মনে তো কখনো এমন করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠে নাই! বালিসে মুখ গুঁজিয়া হেমেন্দ্র উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল। কিছুকাল পরে দীর্ঘশ্বাসের একটা চাপা শব্দ শুনিয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া হেমেন্দ্র দেখিল মা শিয়রে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, তাঁর দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। সে মায়ের চোখের দিকে চাহিতে না পারিয়া আবার বালিশে মুখ লুকাইল। এক হাতে ছেলের একখানি হাত ধরিয়া অন্য হাত তাহার মাথায় বুলাইতে বুলাইতে তিনি বলিলেন—"চল নাইতে যাবি।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তখন সবেমাত্র উষার আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে। সতীশ একটা উঁচু মাটির ঢিপির উপর দাঁড়াইয়া পূব-আকাশের গায়ে চপল সূর্য্যের হোরী খেলা দেখিতেছিল। সহসা পেছন হইতে চারু ডাকিল—"সতীশ দা!"

"এমন সময়ে কেন, চারু?"

"অমনিই এলুম, সতীশ দা।"

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল—"একটা কথা বলবে চারু?"

"কি কথা সতীশ দা।"

"তোমার বাবা তোমার উপর অসন্তুষ্ট কেন?"

"তাতো আমি বলতে পারলুম না, সতীশ দা। পড়াশুনার জন্যে তিনি কখনো আমায় কিছু বলেন না।—বাড়ীর কোন কাজের জন্যও না। শুধু তিনি পছন্দ করেন না যে, আমি বাড়ীর বাইরে পাঁচ জনের সঙ্গে মিশে কোন কাজ করি।"

"তবে ত তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমার সে সব কাজ করা উচিত নয়।"

চারু নিরুত্তর রহিল।

মনে মনে সে অনেকবার সঙ্কল্প করিয়াছে যে, পিতৃ-আদেশ লঙ্ঘন করিবে না—কিন্তু যখন সে শুনিতে পায় যে, উপযুক্ত চিকিৎসা ও শুশ্রূষার অভাবে বাগ্‌দীপাড়ার অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে—তাদের পানীয় জলের পুকুরটা সংস্কারের অভাবে রোগের বীজাণুতে পূর্ণ হইয়া ব্যাধির বিস্তার করিতেছে, তখন যে নিজেকে কোন মতেই

সে স্থির রাখিতে পারে না। গ্রামের সকলের ঔদাসীন্য যেমন তাহার চিত্তের বেদনার সঞ্চার করিয়াছে, তেমনই নিজের অক্ষমতা উপলব্ধি করিয়া সে মনস্তাপে দগ্ধ হইয়াছে। সমবয়স্ক ছেলেদের সঙ্গে মিলিয়া সে তাই তাহার ক্ষুদ্র শক্তি প্রয়োগে যতটুকু পারিয়াছে পল্লীর অভাব মোচনে নিযুক্ত হইয়াছে। একথা সে কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে পারে না—সতীশ দাদাকেও না।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল—"কি চারু, চুপ করে রইলে কেন?"

চারুর চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। সে কহিল—"মনে ত করি যে তাঁর কথা মতই চলব; কিন্তু পারি না যে সতীশ দা। কে যেন সব সময়েই আমার কাণে কাণে বলে দেয় যে, লেখা পড়ার মতই এ সব কাজও করা দরকার। আমি সকল্প ভুলে যাই।"

সতীশ শুনিয়া ভারি আরাম পাইল। সে কহিল—"চল চারু, একটুখানি বেড়িয়ে আসি।

রাস্তার মোড়েই মধু কৈবর্ত্ত আর গোপাল পোদ্দার—"দাদা ঠাকুর! প্রণাম হই" বলিয়া সতীশকে নমস্কার করিল।

সতীশ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ক্ষেতে চলেছিস্ বুঝি? বাড়ীর সব ভাল ত?"

মধু কহিল—"পরাণের ছেলেটাকে দেখতে গিয়েছিলাম, তাইতে কাজে বার হতে দেরি হ'ল। এখান হতেই দেখলাম যে তোমরা আসছ এই দিকে। তোমাকে দু'টো কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে দাঁড়ালাম।"

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল—"কি কথা রে মধু।"

"হ্যাঁ দাদা ঠাকুর, তুমি নাকি হাকিম হবে?"

"কে বল্লেরে?"

গোপাল কহিল—"তুমি ভাব যে, আমরা তোমার কোন খবরই রাখি না।"

"দোহাই দাদাঠাকুর, তুমি হাকিম হয়োনা।" বলিয়া মধু করুণ দৃষ্টিতে সতীশের মুখপানে চাহিল।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল—"কেন রে, তাতে ক্ষতি কি ?"

"না না, সে আমরা পারবনা ঠাকুর।"

"কি পারিবিনে, মধু ?"

"এই তোমার পায়ের ধুলো না নিয়ে দূর হতে সেলাম করা—দাদা-ঠাকুর না বলে হুজুর ধর্ম্মাবতার বলে ডাকা—আমরা তা কিছুতেই পারব না।"

চারু উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

উত্তেজিত হইয়া মধু কহিল—"হাসচ কি বাবু! দাদাঠাকুর তখন আমাদের পর হয়ে যাবে, আমরা আর কথাটিও কইতে পারব না।"

সতীশ কহিল—"নারে, ভয় নেই তোদের। হাকিম আমি হবনা—অত বিদ্যে আমার নেই।"

গোপাল কহিল—"মিথ্যে কয়ো না ঠাকুর! তোমার মত পণ্ডিত এ মুলুকে আর একটা দেখাও, তারপর কয়ো যে হাকিম হবার বিদ্যে তোমার নেই।"

সতীশ কহিল—"বাজে কথায় তোদের কাজের ক্ষতি হচ্চে! চল্ তোদের ক্ষেত দেখে আসি।"

"বেশ ত চল। দেখাব কেমন লক্ষ্মী এসেছেন।"

যাইতে যাইতে সতীশ কহিল—"আমি যদি চাকরী না করে ক্ষেত-খামার করি, তা হ'লে কেমন হয়রে মধু ?"

"হ্যাঁ তোমাদের কিনা এই কাজ! একটা দুপুর রোদ লাগলেই যে গলে যাবে ঠাকুর।"

অনেক চেষ্টা করিয়া সতীশ যখন তাহাকে বুঝাইল যে, রৌদ্রে গলিয়া যাইবার ছেলে সে নয়, আর নিজেও একা কিছু সব কাজ সে করিবে না, তখন উৎসাহিত হইয়া মধু কহিল—"তাহ'লে দাদাঠাকুর তোমার ক্ষেতে সোণা ফলিয়ে দেব। আমাদেরই কি কম হয়, দাদাঠাকুর! কিন্তু সবই যে যায় মহাজনের পেটে। দুঃখের কথা ক'ব-ই বা কাকে? গত সন দেড় কুড়ি টাকা কর্জ্জ করেছিলাম। মাসে মাসে টাকা প্রতি দু পয়সা সুদ গণে দিতে হ'ত। কোন মতে কষ্ট করে তা চালিয়ে ভাবলাম যে, ফসল বেচে সব শোধ দেব কিন্তু বিধির ইচ্ছা দাদাঠাকুর, ও বছর আবার হালের একটা গরু গেল মরে।—হ'ল আমার কর্জ্জ শোধ! আবার টাকা ধার করতে হল। এই বছর ধরে ফসল বেচে ঘটী বাটী বাঁধা দিয়ে সুদ জুগিয়ে আসছি। নইলে, মা লক্ষ্মী যেমন কৃপা করেছেন তাতে পায়ের উপর পা রেখে বসে খেতে পারতাম।"

এই সব কথা বলিতে বলিতে তাহারা মাঠের মাঝে আসিয়া পড়িল। যতদূর দেখা যায় শুধু শ্যামশস্যরাজি, প্রভাত বায়ুর শীতল পরশে যেন শিহরিয়া লুটাইয়া পড়িতেছে। সতীশ চারিদিকে চাহিয়া দেখিল আর আনন্দে তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিল। পল্লীমায়ের মূর্ত্তিখানি এমনই অতুলনীয়, এমনই অনুপম শ্রীবিমণ্ডিতা। আর এই যারা শরীরের বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়া এমন ঐশ্বর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে—নিজেদের সুখ-স্বাস্থ্য বিসর্জ্জন দিয়া পরের জন্য সর্ব্বস্ব দান করিয়া বিনিময়ে যাহারা তাচ্ছিল্য ও নির্য্যাতন ভোগ করিতেছে—মানুষত তাহারাই! শহরের বাবুরা তো পরগাছারই সামিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সতীশের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সে বিবাহের আদিতে এতটুকু রোমান্স জমে নাই, পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হয় নাই, পত্নীর সঙ্গে মিলনের চেষ্টায় সতীশকে নানা রকম অপ্রত্যাশিত বাধা বিপর্য্যয় অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে হয় নাই। বেশীর ভাগ বাঙালী কিশোর কিশোরীর মিলন যেমন করিয়া ঘটক আর পুরুতের সাহায্যেই হইয়া থাকে, ঠিক তেমনই মামুলী ধরণে সতীশ আর মনোরমা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে, দুজনার কেহই কাহাকে না জানিয়াই শালগ্রাম সম্মুখে শপথ করিয়া সারাটা জীবনের মত পরস্পরের দাবী দাওয়া মিটাইয়া চলিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে।

বিবাহের আগে সতীশের মনে কোন রকম প্রশ্নই জাগে নাই। সংসারের পাঁচটা দৈনন্দিন কাজ যেমন সহজেই সকলে করিয়া যায়, সমাজের প্রচলিত নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া জীবনের এই গুরুতর ব্যাপারটাও সতীশ তেমনই সহজেই সারিয়া লইয়াছে। কিন্তু বিবাহের পরে পত্নীর সঙ্গে পরিচয়ের ফলে সতীশ যখনই বুঝিতে পারিল যে, তার জীবনের আদর্শের প্রতি মনোরমার এতটুকু শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি নাই, তখনই সতীশের মন ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। তাই সেদিন সকালে ছাতে বসিয়া সতীশ ভাবিতেছিল, সমাজের বাঁধা পথেই চলা নিরাপদ মনে করিয়া সে কেন এমন ছেলে-মানুষী করিয়া বসিল? বিবাহিত জীবনের সুখ ও শান্তি বজায় রাখিবার জন্যই কি সে তার জীবনের সকল স্বপ্ন বিফল হইতে দেবে?

দাদার সন্ধানে ছাতে আসিয়া কমলা দেখিল, সতীশ এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। শরতের আকাশে কাল একখানি মেঘ ভাসিয়া আসিয়া যেমন তাহার স্বচ্ছ নিলীমা ম্লান করিয়া দেয়, বিবাহের পরই দাদাকে অমন বিমর্ষভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া কমলার প্রফুল্ল মনও তেমনি একটা সন্দেহের কালছায়া পাতে মলিন হইয়া গেল।

ধীরে ধীরে সতীশের পাশে গিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—"একটা কথা বলব?"

"কি কথা রে?"

"বউ কেমন হয়েচে?"

"সে বিচার কে করবে রে।—আমি, না, তোরা?"

"আমাদের ত খুবই পছন্দ হয়েচে, বেশ বউ।"

"হ্যাঁ, খাসা মোমে গড়া পুতুলটী এনেচিস! কিন্তু—"

"কিন্তু?……"

"কিছু নয়" বলিয়া সতীশ অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। কমলা ভাবিল অদৃষ্টের একি কঠিন পরিহাস! স্বামীর লাঞ্ছনা, আর নির্য্যাতন সইতে না পারিয়া যখন জীবনটাকে নিতান্ত দুর্ব্বহ মনে করিয়া সে পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিয়াছিল, তখন করুণার অবতার, মূর্ত্তিমান সহিষ্ণুতা, তাহার এই দাদাটাই নাকি শত রকমে সান্ত্বনা দিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। আর আজ কিনা নব পরিণীতা বধূটির এতটুকু ত্রুটি, তার অন্তরের এতটুকু দুর্ব্বলতা দেখিতে পাইয়া সে এমন অবুঝের মত বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে!

সে কহিল—"দাদা, এতটুকু ওই মেয়েটির প্রতি তুমিও অবিচার করবে? দুদিনের চেষ্টাতেই তুমি ওকে ঠিক নিজের মনের মতটি করে গড়ে তুলতে পারবে।"

প্রাণ-প্রতিষ্ঠা

সতীশ কহিল—"না কমল, সে আর সম্ভব নয়! এর প্রকৃতি ভিন্ন ধাতু দিয়ে গড়া, এর শিক্ষা-দীক্ষা সবই ভিন্ন ধরণের। এর জীবনের মুকুলিত লতাটি যে আশ্রয় লাভের আশায় নবীন পল্লব বাতাসে মেলে ধীরে ধীরে দিনে দিনে বেড়ে উঠেচে, ঠিক তেমনটি আশ্রয় না পেয়ে আজ সত্যি সত্যিই বেদনায় সঙ্কুচিত হয়ে পড়েচে। সে আমায় এর মাঝেই শুনিয়ে দিয়েচে যে পাড়াগাঁয়ে বাস করা তার পোষাবে না। তার বাবা একটু চেষ্টা করলেই যে আমায় একটা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট করে দিতে পারেন, তাও আমায় জানিয়ে দিয়েচে।"

কমলা হাসিয়া ফেলিল। তারপর বলিল—"এই কথা শুনেই তুমি মন গুমরে মরচ। বাংলার মেয়েরা যেমন শিক্ষা পায়, সমাজে যাদের সঙ্গে চলা ফেরা করে, তার ফলে স্বভাবতই তারা জীবনের অমনি আদর্শই গড়ে নেয়। আমিও তো ওই রকমই ছিলুম! আমায় যদি ফেরাতে পেরেচ, তা হলে আমার চেয়েও শিক্ষিতা, অমন বুদ্ধিমতী এই মেয়েটিকে আর ফেরাতে পারবেনা?

"তোর এই খেয়ালী দাদাটার উপর তোর যে একটা অগাধ ভক্তি ছিলরে কমল! সবার তো তা থাকেনা।"

কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কমলা কহিল—"অনেক সুকৃতির ফলে তোমার মত ভাই পেয়েচি দাদা।"

"দেখ কমল, তুই শুধু আমার বোন নস, তুই বাংলা নারী-চিত্তের ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার মূর্ত্তিমতী প্রতিমা। তোকে দেখলে সারা বাংলা দেশের মেয়েদের কথা আমার মনে পড়ে আর আশায় গরবে আমার বুকটা ফুলে ওঠে। আমার কেবলি মনে হয় তোরা যদি সব মানুষের হাতে পড়তিস্ কমল, তা' হলে এই দুর্দ্দিনেও বাঙালীর ঘর, বাঙালীর মন নিবিড় শান্তিতে পূর্ণ থাকত।

অন্য কেহ সতীশের এই উক্তি শুনিয়া হয়ত বিস্মিত হইত, কিন্তু কমলা জানে তাহার দাদা মুখে যা বলেন, তা তাঁর অন্তরেরই কথা। কত শান্ত সন্ধ্যায় এই ছাতের উপর ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে তাহার নিকট সতীশ নিজের জীবনের আদর্শ ব্যক্ত করিয়াছে। যে কাজের ভার নিজে সে গ্রহণ করিয়াছে, কত যুক্তির সাহায্যে সেই কাজের অংশ লইবার জন্য কি ব্যাকুল ভাবেই সে কমলাকে আহ্বান করিয়াছে। প্রথম প্রথম কমলা কিছুই বুঝিত না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে একে একে বিষয়গুলি তাহার নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। সতীশের শিক্ষার ফলেই সে বুঝিল যে, কেবল স্বামী অথবা তাঁর পরিবারের প্রতি নয়, দেশের প্রতি সমাজের প্রতিও তাহার একটা কর্ত্তব্য রহিয়াছে আর সে কর্ত্তব্য তাকে পালন করিতে হইবে।

কমলা কহিল—"আমি এবার নীচে চল্লুম দাদা। কল্পনায় একটা অপ্রীতি বাড়িয়ে তুলে বৌদিকে কিন্তু ব্যথা দিয়োনা।"

কমলা নীচে নামিয়া গেল। সতীশ ছাতের উপর ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কাল সারারাত দুশ্চিন্তার যে ঘন তমোরাশি তাহার সারাটা চিত্ত আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, আজ তাহা অপসৃত হইয়াছে। সত্যই তো, মনোরমার প্রতি কি অবিচারই না সে করিয়াছে। ওই কিশোরীর কাছে যে কর্ত্তব্যপরায়ণতা সে দাবী করিয়াছে, তাহা তো সমাজের শিক্ষিত পুরুষদের কাছেও পাওয়া যায় না। প্রথম পরিচয়ের সময়েই এমন সব প্রশ্ন সে উত্থাপন করিয়াছে যাহা মনোরমার মত বয়সে বোঝাই দুরূহ। সতীশ ভাবিয়া বিস্মিত হইতেছিল, এসব কথা আগে তাহার মনে হয় নি কেন?

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সতীশের সহপাঠী বিনোদ বি-এ পাশ করিয়া মেডিক্যাল কলেজে পড়িতেছে। সে সঙ্কল্প করিয়াছে যে, পরিণয় সূত্রে কখনো আবদ্ধ না হইয়া দেশের কাজে জীবন অতিবাহিত করিবে। বিবাহের বিরোধী বলিয়া সে সতীশের বিবাহে যোগদান করে নাই এবং পত্রদ্বারা তাহাকে জানাইয়াছে যে, বিবাহ করিয়া সতীশ স্বেচ্ছায় যে নাগপাশে বাঁধা পড়িল জীবনে কখনো তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না। বন্ধুদের মাঝে কেহ বিবাহ করিলে বিনোদ তাহার সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখে না, কিন্তু সতীশকে সে এত ভালবাসে যে চেষ্টা করিয়াও তাহাকে দূরে ঠেলিতে পারিতেছে না, তাই ছুটীতে সে সতীশদের গ্রামে বেড়াইতে আসিয়াছে।

বন্ধুর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই বিনোদ জিজ্ঞাসা করিল—"কিরে সতু! বিবাহিত জীবনটা খুবই মধুর বলে মনে হচ্ছে, না?"

সতীশ হাসিয়া জবাব দিল—"বড় যে তেতো লাগছে, তাও নয়।"

বিনোদ বলিল—"এর মাঝেই এতটা, একেবারে শ্রীচরণকমলেষু!"

"তুমি কিরূপ প্রত্যাশা করেছিলে বিনোদ?"

"প্রত্যাশা আমি কিছুই করিনি, সতু। যারা বিয়ে করেচে, তাদের দিয়ে যে কোন কাজই হয় না, সে আমি বেশ জানি।"

"দেশ শুদ্ধ লোক সন্ন্যাসী হলে বেশ হয় না, বিনোদ?"

"তা কেনরে মূর্খ! সাধারণ লোকে যা করতে চায় করুক। তারা সংসার করুক, ছেলে মেয়ের জন্ম দিক, পুষ্করিণী, পাকা বাড়ী

যা ইচ্ছে তাই করুক!—তাতে আমার কিছু দুঃখ হবে না। কিন্তু তোর মত লোক সতু, যার প্রাণ আছে, শক্তি আছে—সে কেন কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত সংসারের বোঝা কাঁধে ফেলে কেবলই ঘুরে মরবে!"

"আমার মত লোককে তুমি কি কর্‌তে বল বিনোদ?"

উত্তেজিত হইয়া বিনোদ কহিল—"আমি এই বাংলা দেশে এমন শত শত শিক্ষিত, উন্নত, ক্ষমতাসম্পন্ন যুবক দেখতে চাই, যাদের সংসারে কোন বন্ধন থাক্‌বে না, চিত্তের কোথাও এতটুকু দৌর্ব্বল্য থাকবে না, কর্ত্তব্য পালনের জন্য যারা জীবনটাকে হাসিমুখে বিসর্জ্জন দিতে পারবে।"

"কি তারা করবে বিনোদ?"

"তুই কখনো পাহাড়ে উঠেছিস্, সতু? দেখেছিস্ দুর হতে পথ দেখা যায় না—শুধু পাথরের স্তূপ, আর রাশি রাশি এলোমেলো জঙ্গল! মন স্থির করে একবার পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করলেই দেখবি কেমন সব পথ রয়েচে, যা ধরে একেবারে চূড়ায় গিয়ে ওঠা যায়। আগে কতকগুলি আত্ম-ত্যাগী কর্ম্মী গড়ে তোল, দেখ্‌বি কাজের আর অন্ত থাকবে না।" কিছুকাল নীরবে থাকিয়া বিনোদ আবার কহিল—"এসব কথা তোকে বলে আর লাভ নেই। তুইত অধঃপাতে গেছিসুই, সতু, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরও কতকগুলি ছেলেকে টেনে নিবি কেন?

"সে কি হে! আমি আবার কাকে নষ্ট করলুম?"

"কেন, চারু ছেলেটি ছিল বেশ; কিন্তু তুই তাঁর সর্ব্বনাশ করেচিস। তার সামনে তুই এমন আদর্শ স্থাপন করেচিস, যার মোহে পড়ে তার ভিতরকার আগুনটুকু নিভে যাচ্ছে।"

"না না। চারুকে তুমি টেনে নিয়োনা। তাকে দিয়ে আমার অনেক কাজ হবে।"

বিনোদ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল তারপর বলিল—"তোর আবার কাজ কিরে, সতু! অন্দর ছাড়া তোর কাছেতে সারা জগৎ লুপ্ত হয়ে গেছে, তোর তনু মন সবইত একজনেরই চরণে বিকিয়ে দিয়েছিস! চারু আবার তোর কি করবে?"

সতীশ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিল—"তোমার মতে যারা সায় দেবে না, তাদের সম্বন্ধেই তুমি যে এমন তীব্র সমালোচনা করবে, তা হতে পারবে না। তুমি কি করতে চাও, সে বিষয়ে তোমার নিজেরই কোন একটা স্পষ্ট ধারণা নেই—অথচ তুমি চাও যে, লোকে তোমার কথা নির্ব্বিবাদে মেনে চলুক। দুনিয়া তেমন হয় না বিনোদ।"

"হবে না কেন, তাত আমি মোটেই বুঝতে পারি না, সতু! তোরা যে একে একে সরে পড়েছিস্, তাতে কাজের কোন ক্ষতি হবে মনে করিস? কাজের লোক আসবেই।"

"যারা আসবে, তারা যখন দেখবে যে, এ পথ ধরে এগুলে গন্তব্যস্থানে পৌছান যাবে না—শুধু ঝোপে জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়ে কাঁটার খোঁচা খেয়েই মরতে হবে, তখন একে একে তারা সবাই ফিরে যাবে। ভুল যাদের ভাঙবে না, তাদের জীবনটা একেবারেই ব্যর্থ হবে।"

বিনোদ কহিল—"শোন সতু, মানুষের পক্ষে ঠিক করা খুবই কঠিন যে, তার জীবনটা সার্থক হবে কি বিফলে যাবে। আমাদের সবারই মাথার উপর যে সূক্ষ্মসূত্রে আবদ্ধ তরবারি ঝুলচে, সে কথাটা ভুলে থাকলে চলবে না। কখন কোনদিক হতে একটা পাগলা হাওয়া এসে সেই বন্ধনরজ্জু ছিঁড়ে ফেলে এক মুহূর্ত্তে আমাদের সঙ্গে দুনিয়ার সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করে দেবে, তা কে বলতে পারে?"

সতীশ এ কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না। বিনোদকে সে অনেকদিন হইতেই ভাল করিয়া জানে। তাহার প্রকৃতি যে ধাতু দিয়ে গড়া তার মাঝে এতটুকু খাদ নেই। আজ সে যাহা বলিয়াছে, তাহা যদি শুধু তর্কের খাতিরেই কহিত, তাহা হইলে সতীশ কিছুমাত্র চিন্তিত হইত না; কিন্তু বিনোদ এমন একটি কথা বলে নাই, যাহা সে সত্য বলিয়া মনে করে না। তাহার অন্তরে প্রবল একটা কর্ম্মস্পৃহা জাগ্রত হইয়াছে—আর তাহারি উত্তেজনা বৈদ্যুতিক শক্তির মত প্রবল বেগে তাহাকে টানিয়া লইতেছে কর্ম্মের পথে। সে চায় খাটিয়া খাটিয়া দেহটাকে পাত করিতে—নিজের যাহা কিছু আছে, সর্ব্বস্ব দুই হাতে অপরকে বিলাইয়া দিতে।

আপনাকে সে যে এমন করিয়া ভুলিতে চাহে, কোনরকম একটা কিছু করিবার জন্য সে যে এতটা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে—ইহাই হইতেছে সতীশের ভয়ের কারণ। কাজ করিবার সময় সহজ ও সরল পথ সে যদি খুঁজিয়া না পায়, তাহা হইলে নিজেকে সে সামলাইতে পারিবে না।

সতীশকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া বিনোদ জিজ্ঞাসা করিল—"কিরে সতু, চুপ করে রইলি যে? আমাকে কিন্তু আজই যেতে হবে, সে কথাটি যেন ভুলিস্‌নি।"

"আজ আর যেতে পারচ না, তুমি। আর দুটো দিন থেকে যাও।"

"না গো—না। আমার জরুরি কাজ রয়েচে।" বলিয়া বিনোদ উঠিয়া দাঁড়াইল।

সতীশ কহিল—"রাত নটার আগে ত গাড়ী নেই, এখনই চল্লে কোথায়?"

"একবার চারুর সঙ্গে দেখা করে আসি—তুই বোস।" বলিয়া বিনোদ বাহিরে চলিয়া গেল।

সতীশ খুবই একটা বেদনা অনুভব করিতেছিল। ধীরে ধীরে সে গিয়া পুকুরের বাঁধাঘাটে বসিল। বিনোদ সত্যই বলিয়াছে-যে, জীবন কাহার সফল হইবে কি বিফলে যাইবে সে কথা বলা দুরূহ। সেও ত একটা পথ বাছিয়া লইয়াছে—কে বলিবে তাহার ঈপ্সিত মিলিবে কিনা? স্বেচ্ছায় সে নিজের কাঁধে কতকগুলি কঠোর কর্ত্তব্যের বোঝা তুলিয়া লইয়াছে, সেগুলি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার শক্তি তাহার আছে কিনা সে জানে না—তবে গুরুভারে তাহার মেরুদণ্ড যতক্ষণ না বাঁকিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবে, ততক্ষণ সকল বাধা বিপত্তি তুচ্ছ করিয়া সে সোজা অগ্রসর হইবে।

তাহার কাজের সহায়তা করিবার জন্য যদি সে একজন উপযুক্ত সহকারী পাইত, তাহা হইলে এতদিন সে অনেক কাজই করিতে পারিত। সে আশা করিয়াছিল বিনোদ হয়ত আপনার ভুল বুঝিয়া তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইবে, কিন্তু আজ সে ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে যে, আপাততঃ বিনোদকে দিয়া সে কোন কাজই পাইবে না। চারু ও কমল তাহাকে নিশ্চিতই সাহায্য করিবে, কিন্তু চারু ত ছেলেমানুষ, আর কমল? তাকেও ত নিজের সংসারের পরিজনবর্গের সেবা করিতে হইবে।

একজন পারিত তাহার সমস্ত হৃদয় ঢালিয়া সতীশের কাজের সাহায্য করিতে—প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়া নিরাশার আঁধার ঘুচাইতে, নারীর সাধনা ও সহিষ্ণুতা লইয়া তাহাকে উন্নতির পথে চালিত করিতে। সে হইতেছে মনু। মনুর শিক্ষা ও দীক্ষা যদি বিপরীত ভাবের না হইত, তাহা হইতে সতীশের কাজ কত সহজ ও সরল হইয়া উঠিত। আদর্শ লইয়া মনোরমার সঙ্গে তাহার আর কোনপ্রকার বাদ বিতর্ক উপস্থিত হয় নাই। তবু যেন কেমন করিয়া একটা অপ্রীতির ভাব জাগিয়া উঠিয়া

তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা ব্যবধান ঘটাইয়া তুলিয়াছে। এত কাছে থাকিয়াও এতদূর তাহারা !

সম্মুখে চাহিয়া সতীশ দেখিতে পাইল, সহকার গাছের একখানা ছোট ডাল ভাঙিয়া শুকাইয়া গিয়াছে। কিন্তু তবুও ব্রততী-বিতানের কোমল বন্ধন-বিচ্যুত হয় নাই। নীচের আকর্ষণ, বাত্যার আন্দোলন, কিছুই উহাকে ছিনাইয়া লইতে পারিবে না। যুগে যুগে, কালে কালে, সৃষ্টিতে একের সঙ্গে অন্যের এমনই মধুর বন্ধনের বিচিত্ররূপ প্রকটিত হইয়া আসিতেছে। সতীশ ভাবিল, এমন অপরাধ সে কি করিয়াছে, যাহাতে এই নিবিড় বন্ধনের বিমলানন্দ হইতে সে বঞ্চিত থাকিবে।

সারাদিনের সজাগ পাহারায় ক্লান্ত হইয়া সূর্য্য তখন পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িয়াছিল, পুষ্করিণীর এক কোণের একটি বাতাবী লেবুর গাছ হইতে সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। একা বসিয়া বসিয়া সতীশের আর ভাল লাগিল না—সন্ধ্যা অবধি মাঠের ধারে ঘুরিয়া বেড়াইয়া সে ঘরে ফিরিল।

আঙিনায় পদার্পণ করিয়া সতীশ দেখিল মনোরমা মাটির প্রদীপটি হাতে লইয়া তুলসীতলায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পায়ের শব্দ শুনিয়া অবগুণ্ঠনের আড়াল থেকেই মনোরমা সতীশের দিকে চাহিল। দিবা-রাত্রির সন্ধিক্ষণে নূতন করিয়া আবার তাহাদের চারি চক্ষুর মিলন হইল।

ঠিক সেই সময় ঠাকুর ঘরের আরতির শাঁখ বাজিয়া উঠিল।

নবম পরিচ্ছেদ

মনোরমা একা বসিয়া পান সাজিতেছিল। কমলা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"দাদা কোথা ভাই ?"

"বাঃ, আমি কিনা জানি !"

"সত্যি ভাই, বলনা কোথায় ? বড্ড দরকার।"

কাপড়ের আঁচল ভাল করিয়া ঝাড়িয়া দেখাইয়া মনোরমা কহিল—"যাঃ পালিয়েছে দেখছি !"

কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করিয়া কমলা কহিল—"আমি তোমার ননদ !"

হাসিয়া কমলা জবাব দিল—"আমি ভাবতুম সতীন বুঝি !"

"পোড়ারমুখী বউ !" বলিয়া কমলা ভ্রাতৃজায়ার গাল টিপিয়া দিল। তারপর স্নেহার্দ্রস্বরে কহিল—"এতক্ষণ একলাটি ছিলে, খুবই কষ্ট হচ্ছিল, না ?"

"সেই যে ভাই-বোন দুজনা গিয়ে ছাতে উঠ্‌লে, আর নামবার নামটিও নেই। ছাতের উপর গেলুম, কিন্তু কারু দেখা পেলুম না। কোন কাজ না পেয়ে এই পানগুলি নিয়ে বসে পড়লুম। কাল চলে যাচ্ছ আবার কতদিনে দেখা হবে !"

"যাব বলেই তো কাজের এত ভিড়।"

"কি জানি ভাই, তোমাদের কাজের কথা কিছুই তো আমি বুঝিনে !"

কথাগুলি মনোরমা এমনই করুণ স্বরে কহিল যে, তাহাতে একটা প্রচ্ছন্ন বেদনার পরিচয় পাইয়া কমলা ভাবিল এমন স্নেহময়ী মেয়েটির প্রতি দাদা কি অবিচারই করিতেছেন !

কমলাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া মনোরমা কহিল—"রাগ করলে কেন ভাই? আমি ত আর তোমাদের কাজের নিন্দা করিনি!"

মনোরমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কমলা ডাকিল—"বউদি!"

"আবার!" বলিয়া মনোরমা নিজেকে কমলার বাহুবন্ধন হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিল।

মনোরমা জিজ্ঞাসা করিল—"কেন, আবার কি হলো?"

"কেউতো এখানে নেই, তবু কেন আমায় বউদি বলছ?

"ভুল হয়েছিল, ভাই" বলিয়া কমলা খুব কোমল কণ্ঠে এবার ডাকিল—"মনু!"

"কি, ভাই?" মনোরমা কমলার আরোও কাছে সরিয়া বসিল। তাহার তৃষিত চিত্ত এতটুকুই আদরের জন্য কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। কমলা তাহা বুঝিয়াছিল এবং বুঝিয়াছিল বলিয়াই সহানুভূতিতে তাহার সমস্ত হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছিল।

কমলা একবার ভাবিল যে, মনোরমাকে সব কথা খুলিয়া বলিয়া, সতীশ যাহা চায় তাহা ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দেয়; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল যে, মনু হয়ত তাহাতে আরো ব্যথা পাইবে। ভ্রাতৃজায়া বলিয়াই যে সে মনুকে এত ভালবাসে তাহা নহে, কি জানি কেন প্রথম দর্শনেই মনোরমাকে তাহার আপন জন বলিয়াই মনে হইয়াছিল। এ বাড়ীতে মনোরমার সুখ-দুঃখের দিকে নজর রাখা যেন একমাত্র তাহারই কর্তব্য।

"মা পূজোয় বসেছেন, চল ঠাকুর ঘরে যাই।" বলিয়া কমলা ভ্রাতৃবধূর হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পিছন হইতে সতীশ কহিল—"কিরে, কোথায় চল্লি তোরা?"

মনোরমা কমলার হাত ছাড়াইয়া অবগুণ্ঠন টানিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

প্রাণ-প্রতিষ্ঠা

কমলা কহিল—"তোমার সঙ্গে আমার অনেক জরুরী কথা রয়েছে দাদা !"

"এত কথা বলবার অভ্যাস তোর আবার কবে থেকে হ'ল কমল ?"

"যেদিন থেকে তোমার কাঁধের ভূত আমার উপর চাপিয়ে দিয়েছ।"

মনোরমা ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছিল। কমলা তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া কহিল—"পালাও কেন, বোস না।"

চুপি চুপি সে জবাব দিল—"আমি এখন ওঘরে চল্লুম, কেউ আবার এসে পড়বে।"

কমলা বাধা দিবার পূর্ব্বেই সে শোবার ঘরে ঢুকিয়া খাটের উপর শুইয়া পড়িল। আজ সারাটা সকাল কেবলই একটা ব্যথা তাহার বুকে কাঁটা বিঁধাইতেছে। সে স্বামীর ভালবাসা পায় নাই ! স্বামী যেন তাহাকে লইয়া শুধু পুতুলেরই মত খেলা করেন, সমস্ত হৃদয় দিয়া কিছুতেই তাহাকে আপন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না !

নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া কমলা জিজ্ঞাসা করিল—"কি ভাবছ ভাই ?"

মনোরমা জবাব দিল না, মুখ ফিরাইয়া লইল।

কমলা কহিল—"বাবা এসেছেন, মনু।"

চক্ষু মুছিয়া মনোরমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল।

"অত ব্যস্ত হতে হবে না। সঙ্গে দুজনা ভদ্রলোক এসেছেন, বৈঠকখানায় বসে বাবা তাঁদেরই সঙ্গে গল্প করছেন।" বলিয়া কমলা স্নেহমাখা স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কাঁদছিলে কেন, ভাই ?"

"বাঃ রে, কাঁদলুম কখন ?"

মনোরমা হাসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু চক্ষু দুইটি আবার জলে ভরিয়া উঠিল।

"তবে নাকি কাঁদনি।"

মনোরমা নিজেকে আর সামলাইতে পারিল না। কমলাকে জড়াইয়া ধরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। কমলাও বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল—তাহারও চক্ষু অশ্রুপূর্ণ। সে ত জানে স্বামীর তাচ্ছিল্য নারী-হৃদয়ে কি বিষম শেল বিঁধাইয়া দেয়। সে কহিল—"দাদাকে তুমি জান না বলেই এত ব্যথা পাচ্ছ। ভাল ক'রে যখন তাঁর পরিচয় পাবে, তখন দেখবে কত কোমল তাঁর হৃদয়, আর স্নেহের কি এক অফুরন্ত উৎস রয়েছে তারি মাঝে।"

মনোরমা আরো অধীর হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে তাহা জানে! জানে বলিয়াই ত তাহার বুকে এমন আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কমলা চেষ্টা করিয়াও কোন কথা বলিতে পারিল না, সান্ত্বনার কোন কথাই সে খুঁজিয়া পাইল না।

"কমল কোথা রে?" বলিয়া তারানাথ ঘরে ঢুকিলেন। মনোরমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া শ্বশুরকে প্রণাম করিল। কমলাও পিতার পায়ের ধূলি লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার শরীর ভাল ত বাবা?"

"হ্যাঁ, বেশ ছিলুম সেখানে। খাওয়াদাওয়ার কি যত্নটাই তাঁরা করেচেন।"

কমলা কহিল—"তাই বুঝি বাড়ীর কথা মনেও ছিল না।"

তারানাথ হাসিয়া কহিলেন—"জানিস্‌ইতো তোর এই বুড়ো ছেলেটার স্বভাব। তারপর ননদ-ভাজে বসে কি কথা হচ্ছিল?"

অবগুণ্ঠনের ভিতর থেকে কাতর দৃষ্টিতে মনোরমা ননদের দিকে চাহিল, সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিয়া কমলা পিতার কাছে সাফ মিথ্যা বলিয়া ফেলিল—"ওদের দেশের গল্প শুনছিলুম।"

"সেই জন্যই বুঝি মায়ের চোখ দুটি জলে ভরে গেছে। তুই কিন্তু দুষ্টু। কোথায় দুটো গল্প বলে ওকে ভুলিয়ে রাখবি; তা নয়, বাড়ীর কথা বলে ওর মনে ব্যথা দিচ্ছিস্।"

মনোরমা কহিল—"আপনার নাইবার সময় হয়েছে বাবা।"

"হ্যাঁ, বাবু দুটি ফিরে এলেই নাইতে যাব। বড্ড ভাল লোক ওঁরা। একসঙ্গে পড়তুম, কতদিন পরে আবার দেখা।"

তারানাথ বাহিরে চলিয়া গেলেন। মনোরমা কমলার হাত দু'খানি চাপিয়া ধরিয়া সজল চোখে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এমন সৌভাগ্য কজনার হয়, এত লোকের এমন স্নেহ সংসারের কটি লোক পাইয়া থাকে? তবু কেন তাহার অন্তরে ব্যথা জমিয়া উঠিতেছে? স্বামীও তাহাকে ঘৃণা করেন না, সেদিক থেকেও আদর যত্নের এতটুকুও ত্রুটি নেই। তবুও কেন তার বুকটা যখন তখন ব্যথায় ভরিয়া উঠে, কেন সে চোখের জল চেষ্টা করিয়াও চাপিয়া রাখিতে পারে না?

কমলা ভ্রাতৃবধুর মনের ভাব যেন বুঝিতে পারিল। নিজের আঁচল দিয়া তার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া হাত ধরিয়া বাহিরে লইয়া গেল।

আহারের সময় সতীশের পিতৃবন্ধু যোগেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"সতীশ, তুমি এখন কি করবে ঠিক করেছ?"

সতীশ কহিল—"গাঁয়ে থেকে কৃষি করব ভাবছি।"

"হাঁ, এম-এ পাশ করে শেষটায় কিনা লাঙল ঠেলবে!" বলিয়া যোগেন্দ্রবাবু হাসিয়া উঠিলেন।

"কেন, তাতে ক্ষতি কি?"

তারানাথ কিছুকাল সতীশের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুই তা হ'লে সব ঠিক করে বসেছিস্?"

"হ্যাঁ, আপনাদের যদি এতে অমত না থাকে।" তারানাথ আর কোন কথা বলিলেন না। সতীশের আশঙ্কা হইল যে, পিতা হয়ত সম্মতি দিবেন না।

দশম পরিচ্ছেদ

হলধর খুড়ো চারুর পিতাকে সতীশের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। ফলে, মহিম মুখুজ্জে এমন কঠোর শাসন সুরু করিলেন যে, চারুর পক্ষে তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল। চারুর পিতা একদিন তাহাকে বলিয়া দিলেন যে, সে যেন স্কুল হইতে ফিরিয়া কোন মতেই আর বাড়ীর বাহিরে না যায়। তাঁহার এই আদেশ লঙ্ঘন করিলে তিনি চারুর হাড় ভাঙ্গিয়া তাহাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিবেন, এ কথাও স্মরণ করাইয়া দিতে ভুলিলেন না।

চারু কিছুদিন পর্য্যন্ত পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিল না। কিন্তু সমস্তটা অপরাহ্ন জেলখানার কয়েদির মত আবদ্ধ থাকিতে সে হাঁপাইয়া উঠিত। তাহার সহপাঠীগণ খেলিতে যাইবার সময় যখন তাহাকে ডাকিতে আসিত, তখন সে কহিত যে, সে যাইতে পারিবে না। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে কোন জবাব দিতে পারিত না—দুর্জ্জয় অভিমানের গোপন একটা বেদনা তাহার বক্ষ ফুলাইয়া চক্ষে জল আনিয়া দিত।

সে নীরবে সবই সহ্য করিতেছিল। তাহার মুখের হাসি শুকাইয়া গেল—অন্তরে তাহার নিরাশার একটা গভীর অন্ধকার জমিয়া উঠিল। তাহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইল, পড়াশুনার অবনতি ঘটিল, কিন্তু কেহ তাহা লক্ষ্য করিল না।

ছেলেমেয়েদের চিত্তবৃত্তির প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া তাহাদিগকে একই ছাঁচে ঢালিয়া গড়িবার চেষ্টা করাতেই এই দুর্ভাগ্য দেশের দুঃখ ও দৈন্য আরও বাড়িয়া চলিয়াছে। অভিভাবক শাসন করিতে ব্যস্ত—ছেলের মনের খবর রাখিবার ধৈর্য্য ও আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে

তিনি অক্ষম। ফলে ছেলেকে তিনি জোর করিয়া যেখানে নিজের মনের মত করিয়া গড়িবার চেষ্টায় তাঁহার সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করেন, সেখানে ছেলে হয়ত বা একেবারে বাঁকিয়া বসে, না হয় সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। প্রহারের ব্যথাটাই অধিকাংশ ছেলের বুকে শেলের মত বেঁধে—পীড়নের মূলে যে অভিভাবকের মঙ্গলেচ্ছা বর্ত্তমান, এ কথা বুঝিবার ক্ষমতা তাঁহাদের থাকে না। ছেলেদের কাছে বৃদ্ধের বিচার-বিবেক ও বুদ্ধির প্রত্যাশা করিয়া অভিভাবক যখন তাদের কৈশোরের চাঞ্চল্য ও একাগ্রতাকে অবাধ্যতা ও একগুঁয়েমি মনে করিয়া দণ্ড দেন, তখন তাঁহার অন্তরের স্নেহ ও মমতার পরিচয় না দেওয়াকেই তিনি শাসনের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া বিবেচনা করেন। ফলে, শাসিত বালক অভিভাবককে স্বধু শাসকরূপেই দেখিতে অভ্যস্ত হয়—বিস্মৃত হয় যে, তাদের মাঝে আরও একটা সম্বন্ধ বর্ত্তমান।

চারুর পিতার সহিত কথাবার্ত্তা এক প্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এমন কি গৃহে থাকিয়াও প্রত্যহ তাহাদের সহিত দেখা পর্য্যন্ত হয় না। সর্ব্বদাই চারু পিতার নিকট হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করে। চারুর পিতাও কখনো তাহাকে কাছে ডাকিয়া কোন কথা বলেন না—কেবল সে কোন অন্যায় কার্য্য করিলে ভৎর্সনা করিবার সময় তিনি তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইতেন। চারু পিতৃ-স্নেহের পরিচয় কখনো পাইল না।

সেদিন স্কুল হইতে ফিরিবার সময় চারু শুনিল যে কালু কর্ম্মকারের কলেরা হইয়াছে! কালুর স্ত্রী পিত্রালয়ে, বৃদ্ধা জননী ছাড়া তাহার বাড়ীতে আর কেহ নাই। বাড়ীতে ফিরিয়া চারু পলাইয়া সতীশের বাটী গিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহাকে না পাইয়া একাই কালুকে দেখিতে গেল। সেখানে গিয়া সে দেখিল যে, কালু বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। পাড়ার দু'চারি জন লোক দূরে দাঁড়াইয়া কালুর

মাকে অভয় দিতেছে, কিন্তু কাছে গিয়া কেহ তৃষিত রোগীর মুখে এক বিন্দু জলও দিতেছে না।

চারু উপস্থিত লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিল—"ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়েছে ?" তাহারা কেহই কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না। চারু একটা মেটে কলসী হইতে জল ঢালিয়া আনিয়া কালুর মুখে দিয়া কহিল—"তোমাদের একজন এসে কাছে বোস, আমি ডাক্তার ডেকে আনি।"

কেহই অগ্রসর হইল না। তাহাদিগকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া চারু কহিল—"হুঁ, বুঝেছি! তোমরাই একজন গিয়ে ডাক্তারবাবুকে ডেকে আন—আর আমাদের পাড়ার বেণীকেও একবার এখানে আসতে বলো।"

সংবাদ পাইবামাত্র বেণী ছুটিয়া আসিল এবং চারুকে উঠিতে বলিয়া রোগীর পার্শ্বে বসিয়া পড়িল। চারু কহিল—"আরও দুজনা ছেলে ডেকে আনতে হবে।"

বেণী জিজ্ঞাসা করিল—"সতীশদা'কে খবর দিয়েছিস্ ?"

"সতীশদা' বাড়ী নেই—কখন আসবেন তাও কেউ জানে না।"

"তবেইত ঠেকিয়েছিস্ দেখছি—ছেলেদেরও আজ পাওয়া যাবে না।"

চারু জিজ্ঞাসা করিল—"কেন ?—"কি হয়েছে তাদের ?"

"বাঃ কাল যে উইক্‌লি রয়েছে!"

বাহির হইতে কে যেন কহিয়া উঠিল—"ইস্ উইক্‌লি আবার একটা পরীক্ষা!"

চারু ও বেণী বিস্মিত নেত্রে বাহিরের দিকে চাহিল—দেখিল ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে করিয়া রাখাল আসিয়াছে। পরীক্ষা সম্বন্ধে সেই-ই উক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে।

প্রাণ-প্রতিষ্ঠা

ডাক্তার কালুকে ভাল করিয়া দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন এবং প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। রাখাল কহিল—"সে হবে না ডাক্তারবাবু, আপনাকে রাতটা এখানে থাকতে হবে।"

ডাক্তার বলিলেন—"আমি আবার আসব'খন—তোমাদের ভয়ের কোন কারণ নেই।"

ঔষধ আনিয়া বেণী কহিল—"তুই এখন বাড়ী যা চারু, নইলে তোর বাবা বকবেন।"

এতক্ষণ পর্য্যন্ত চারুর মনেই ছিল না যে, সে পিতৃ-আদেশ অমান্য করিয়া এখানে আসিয়াছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহাকে পড়ার ঘরে না দেখিয়া পিতা নিশ্চিতই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন! চারু ভাবিল, সে কি করিবে? এই সংবাদ পাইয়া যদি সে না আসিত, তাহা হইলে এক ফোঁটা ঔষধ না পাইয়া হয়ত লোকটা মরিয়া যাইত।

চারুকে নীরব দেখিয়া রাখাল কহিল—"তোর কিন্তু এখন যাওয়াই ভাল, চারু।"

চারু কহিল—"হ্যাঁ! তোদের মত দুধের ছেলেদের উপর এই কলেরা রোগীর ভার দিয়ে বুঝি নিশ্চিন্ত থাকা যায়!

"ওঃ কত বড় প্রবীন লোক তুইরে, চারু।" বলিয়া রাখাল চারুর পিঠে একটা কিল মারিল।

বেণী কহিল—"না, সত্যি বলছি চারু, তুই বাড়ী যা। ডাক্তার বাবু থাকবেন বলেছেন। আমরা দুজনাই বেশ পারব।"

চারু হাসিয়া উত্তর করিল—"আমার ভাগ্যে আজ প্রহার আছেই—তা একটু আগেই যাই, আর পরেই যাই! তোরা খেয়ে আয়, তারপর আমি যাব'খন।"

রাত্রি দশটার সময় সতীশ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া ছেলেরা আশ্বস্ত হইল। সতীশ কহিল—"চারু, তুমি বাড়ী যাও।"

চারু কহিল—"একে নিয়ে তোমরা বড় মুস্কিলে পড়বে, সতীশ দা।"

"তুইত আগে বাড়ী যা" বলিয়া সতীশ পকেট থেকে একখানা কার্ব্বলিক সাবান বাহির করিয়া দিয়া চারুকে হাত ধুইতে বলিল।

সমস্ত রাত্রি মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া তাহারা কালুকে বাঁচাইয়া রাখিল। ভোরে পাড়ার দুইজন লোকের উপর শুশ্রূষার ভার দিয়া সতীশ নিজে গিয়া সহর থেকে একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক আনিয়া কালুকে দেখাইল এবং পথ্যাদির সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিল। তিনদিন পর কালু অনেকটা সুস্থ হইল। এই তিন দিন কাল সতীশ প্রায় সর্ব্বদাই কালুর পার্শ্বে বসিয়া থাকিত, কেবল দুবেলা আহার করিবার সময় সে গৃহে যাইত। কালুর স্ত্রী আসিবার পর আর সতীশকে রোগীর পার্শ্বে থাকিতে হইত না, সে দিনে দুই তিনবার করিয়া দেখিয়া আসিত।

চারু সে দিন পিতৃ-আদেশ লঙ্ঘন করিয়া কালুর বাটীতে গিয়াছিল বলিয়া মহিম মুখুজ্যে পুত্রকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই। তিনি শুধু চারুকেই শাস্তি দিয়া নিরস্ত হন নাই—সতীশকেও ডাকাইয়া তীব্র তিরস্কার করিয়াছেন। তাহার অসংযত ভাষা এবং অভদ্র ব্যবহারে সতীশ অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া গৃহে ফিরিল। বসিয়া বসিয়া সে মহিম মুখুজ্যের অভদ্র ব্যবহারের কথা ভাবিতেছিল।

তারানাথ গৃহে প্রবেশ করিয়া পুত্রকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিরে সতু! কি হয়েছে তোর?

"না, বাবা—হয়নি কিছুই! চারুর বাপ আমায় আজ বড় তিরস্কার করছেন— বসে তাই ভাবছিলুম।"

"কি তিনি বল্লেন ?"

"তিনি বল্লেন, আমি ছেলেদের এমন সব কাজে উৎসাহিত করছি, যাতে করে তাদের পড়শুনার ক্ষতি হচ্ছে।"

"তোর কি মনে হয়, সতু ?"

"পড়াশুনার ক্ষতির কথাটা আমি আগে মোটেও ভেবে দেখিনি—কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ক্ষতি কিছু হয় বৈকি !

"তা'হলে ছেলেদের তুই আর কোন কাজে ডাকবিনে ঠিক-করেছিস !"

"না বাবা, আমি বুঝে উঠতে পারছিনে, কি করা উচিত।"

কিছুকাল নীরব থাকিয়া তারানাথ কহিলেন—"ছেলেরা পড়াশুনা নিয়েই থাকবে, অন্য কোন কাজে অগ্রসর হবে না—একথাটা শুনতে বেশ। কিন্তু, জিজ্ঞাসা করি সতু, আকাশে বাতাসে যে মন্ত্র ধ্বনিত হচ্ছে, তা কি তাদের কাণে পৌছবে না ? তুই ভাবছিস যে, তুই-ই এখানকার ছেলেদের চিত্তে এক নূতনভাব এনে দিয়েছিস্ ; কিন্তু তা নয়, সতু। তোর অন্তরে যিনি দেশের কাজ করবার বাসনা জাগিয়ে দিয়েছেন—ছেলেদেরও পাটোয়ারী বুদ্ধি তিনিই খাট করে দিয়েছেন। তাঁরই কৃপায় এই সব তরুণ-হৃদয় উৎসাহে নেচে উঠেছে।—আর পড়াশুনার ক্ষতির কথা বলছিস ? ছেলেরা যে কাজ করে, তাতে পড়াশুনার ক্ষতি কি করে হবে ? দেশে দুর্ভিক্ষ অথবা জলপ্লাবন কিছু নিত্য আসে না। ছেলেদেরও তার জন্য রোজ কিছু খাটতে হচ্চে না। আর অন্নাভাবে, জলপ্লাবনে, রোগতাড়নায় যখন দেশের লোক দলে দলে মরে যাবে—তখন যদি পড়ার ঘরের দরজা জানাল্লা বন্ধ করে একাগ্রচিত্তে তুই পড়া আওড়াতে পারিস, তাহলে বুঝব তুই হৃদয়বিহীন পাষাণ !—বুঝব, যে বিদ্যার্জ্জনের জন্যে তুই সব বিসর্জ্জন করেছিস,

সে বিদ্যা দেবার মত তোকে কিছুই দিতে পারেনি—তোকে মানুষ করে গড়তে পারে নি।" সতীশ বিস্মিত নেত্রে পিতার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

তারানাথ পুনরায় কহিলেন—"একদিন ছিল যখন এই ভারতবর্ষের ছাত্রেরা সংসারের অন্য সব কথা ভুলে বাণীর আরাধনায় নিবিষ্ট থাকত। দেশের তখন এক ভিন্ন অবস্থা ছিল। তখন অভাব ও পীড়ন তাদের যোগভঙ্গ করত না। কিন্তু ছেলেরা যে পুঁথির পাতায় ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু মৃত্যুর হার দেখে আজ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠচে—দুনিয়ার ইতিহাস আলোচনা করে নিজেদের দৈন্য ও দুর্ব্বলতার পরিচয় পেয়ে তাদের বক্ষ যে বেদনায় ফুলে উঠেছে! এমন সময় বই ঠেলে ফেলে দেওয়াই না মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক! পরীক্ষার খাতায় নম্বরের আঁক ফেলতে যদি জীবনের সবটাই শূন্য থেকে যায়, তবে জীবনের কিছু সম্বল যোগাতে পরীক্ষার খাতায় অর্দ্ধেক নম্বর উঠলেও সংসারে একেবারে দেউলে হতে হবে না।"

সতীশ বা তারানাথ বহুক্ষণ আবার কেহই কোন কথা কহিলেন না। কিছুকাল পরে তারানাথ ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—"আজকার দিনেও একথা যারা ভাবে সতু, যে, তারা কেবল পুঁটুলিই বাঁধবে, ব্যয় কিছু করবে না—তাদের মত ভ্রান্ত আর কেউ নেই। এমন সময় আসচে যে, যতটুকু যে দান করবে, লাভ তার ততটুকুই হবে। সবই গ্রাস কর্‌তে যে চাইবে—নিরাশার বেদনা তার প্রাণে সব চেয়ে কঠোর আঘাত কর্‌বে। তাই বল্‌ছি সতু, যে পথ বেছে নিয়েছিস্ তুই, সেই পথ ধরেই সোজা এগিয়ে যা—মিছে সংশয়-তিমিরে নিজেকে আচ্ছন্ন রাখিসনে। বংশধর সৃষ্টিধর তোরা, তোদের আশ্রয় করেই দেশের অতীত ও বর্ত্তমান মিলে ভবিষ্যতে গড়ে উঠবে—একটা বিরাট সভ্যতা যথার্থ সত্য সুন্দর ও মঙ্গলরূপেই জগতে প্রতিষ্ঠিত হবে।"

প্রাণ-প্রতিষ্ঠা

সতীশ জীবনে কখনো তাহার পিতাকে এমন উত্তেজিত হইতে দেখে নাই। সে মনে করিত দেশের এই নব ভাব তাহার পিতা এবং তাহাদেরই মত প্রবীন লোকদের চিত্ত আন্দোলিত করে নাই, কেবল তরুণ হৃদয়ই নাচাইয়া মাতাইয়া তুলিয়াছে ; কিন্তু আজ সে বুঝিল যে এমন শক্তি জাগ্রত হইয়াছে যাহাতে মরা গাঙে বাণ আসিয়াছে—শুষ্ক-তরু মুঞ্জরিত হইয়াছে। অশ্রুপূর্ণ নয়নে সতীশ চাহিয়া দেখিল তাহার পিতা গৃহে নাই। তাহার মনে হইল—

"এ যৌবন জল-তরঙ্গ রোধিবে কে ?
—হরে মুরারে, হরে মুরারে !"

একাদশ পরিচ্ছেদ

জেলের জমাদারকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া গোবর্দ্ধন ভৈরবদাসের সঙ্গে একত্র কাজ করিবার অনুমতি পাইয়াছে। কাজ করিতে করিতে ভৈরব যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন গোবর্দ্ধন নিজের কাজ অসমাপ্ত রাখিয়া তাহার কাজ করিয়া শান্তি গ্রহণ করে।

আজও ভৈরবের কাজ শেষ করিয়া গোবর্দ্ধন তাহার সম্মুখে পাথরের একটা বিরাট স্তুপ দেখিতে পাইল। এগুলি তাহাকেই ভাঙ্গিয়া টুক্‌রা করিতে হইবে। ক্ষণেকের তরে তাহার চিত্তে একটা অবসাদ আসিল কিন্তু পরক্ষণেই দ্বিগুণ উৎসাহে সে কাজে লাগিল। তাহার হাতের হাতুড়ী যেন বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিচালিত হইয়া আগুনের ফুল্‌কি ছিটাইতে লাগিল। ভৈরবদাস তাহার এই নবীন বন্ধুর কাজের সহায়তা করিতে করিতে বিস্মিতনেত্রে তাহার দিকে চাহিতেছিল। শেষ পাথরের খণ্ড ভাঙ্গিয়া টুক্‌রা করিয়া গোবর্দ্ধন যখন হাতের হাতুড়ীটাকে ফেলিয়া দিল, তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে ঘাম ঝরিয়া পড়িতেছিল, চক্ষের সম্মুখে কালো একটা আবরণ ছাড়া আর কিছুই সে দেখিতে পাইল না। বন্ধুর ক্লান্তি লক্ষ্য করিয়া ভৈরব গায়ের উর্দ্দিটা খুলিয়া তাহাকে হাওয়া করিতে লাগিল। অনেকটা সুস্থ হইয়া হাসিয়া সে কহিল—"শালারা কি কাজই দিয়েছে!"

ওভারসিয়ার কাজ বুঝিয়া লইলে সমস্ত কয়েদি শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইল এবং আদেশ মত শ্রান্ত দেহগুলি টানিয়া লইয়া নিজ নিজ কক্ষে গিয়া শুইয়া পড়িল।

আহারান্তে ভৈরবদাস বাতায়নের কাছে গিয়া বসিল। দূরে

প্রাণ-প্রতিষ্ঠা

আকাশপ্রান্তে ক্ষুদ্র দুইটি তারকা ম্লান দৃষ্টিতে পৃথিবীর পানে চাহিয়াছিল। দেখিয়া দেখিয়া ভৈরবের মনে হইল ও যেন তাহারই কন্যা চাঁপার ছল ছল আঁখি দুটি তাহারই পথপানে চাহিয়া ব্যর্থ আশার গাঢ় বেদনায় অত ম্লান হইয়া গিয়াছে। যাহাদের আশ্রয়ে কন্যাকে সে রাখিয়া আসিয়াছে, তাহারা তো ঐশ্বর্য্যস্ফীত, মদগর্ব্বিত, পাথরেরই মত হৃদয়-বিহীন!

কারা-প্রাচীরের বাহিরে, প্রান্তরের পরপারে ক্ষুদ্র ওই গ্রামখানির পরের গাঁয়েই নীলমণি দত্তের বাড়ীতে তাহারই দশমবর্ষীয়া আদরিণী কন্যা চাঁপা-আজ দাসীর কাজ করিতেছে; যদি তাহার উড়িবার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে এই অন্ধকারে গা মিশাইয়া সে কন্যার কাছে ছুটিয়া যাইত, সমস্ত রাত চাঁপাকে বুকে চাপিয়া রাখিয়া ভোরের আগেই আবার এই কারাগারে ফিরিয়া আসিত! জানালার কাছে একাকী বসিয়া বৃদ্ধ এই সব কথাই ভাবিতেছিল।

কাছে আসিয়া গোবর্দ্ধন জিজ্ঞাসা করিল—"কি ভাবছ, দাদা?"

"ভাবছি অভাগী মেয়েটারই কথা। অমন নিষ্ঠুর লোকের আশ্রয়ে না রেখে এসে যদি গলাটিপে তাকে মেরে ফেল্‌তুম, তাহলে নিজে আজ নিশ্চিন্তে এই দেওয়ালের গায়ে মাথা খুঁড়ে মরতে পারতুম।"

সহসা গোবর্দ্ধন বলিল—"তবে আজই, দাদা।"

বিস্মিত ভৈরব জিজ্ঞাসা করিল—"আজ কি?"

"হ্যাঁ দাদা, আজিই, এই রাত্রে, এখনই।" উত্তেজনায় তাহার চক্ষু দুইটি যেন জ্বলিয়া উঠিল।

বৃদ্ধ কহিল—"কি তুই বল্‌ছিস্? আমিত কিছুই বুঝতে পারছি নে!"

"বুঝতে তোমার কিছুই হবে না! তুমি শুধু চুপটি করে থাক। আমি এই জানালা গলিয়ে নীচে নেমে যাব। তারপর পাঁচিল টপকে নীলুদত্তের বাড়ী গিয়ে চাঁপাকে দেখে দু ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে এসে তোমায় খবর দেব।"

ভৈরব শিহরিয়া উঠিয়া তাহার হাত দু'খানি চাপিয়া ধরিয়া কহিল—"তুই ক্ষেপেছিস, ভাই? পাঁচীল টপকে জেল থেকে বার হওয়া! দেখতে পেলে যে মেরে ফেলবে! আমার মেয়ে বেশ আছে, সুখেই আছে—আমারও কোন কষ্ট নেই!"

"ভেবনা যে তোমার জন্যই আমি এ কাজ করতে চাই। ক'দিন থেকে আমারও বুকটা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, ইচ্ছে হচ্ছে ছুটে গিয়ে ছেলেটাকে বুকে চেপে ধরি। কিন্তু তা তো হবার নয়—সে যে অনেক দূর! চাঁপাকে একটু আদর করে বুকের জ্বালা ঘুচাতে চাই। সে ত কাছে রয়েছে।"

"না, না—সে হবে না। আমি কিছুতেই তোকে যেতে দেব না। আর চাঁপা ত তোকে চিন্‌বেও না।"

"বাধা দিয়োনা, কথাটিও কয়োনা! আমি যাবই; নইলে আমি বাঁচবনা!"

ভৈরব ভাবিল—"হায়! তাহার এই নবীন-বন্ধুটি কতবড় বিপদের মাঝে যে নিজেকে ঢালিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে, উত্তেজনার ঝোঁকে তাহা নিজেই সে বুঝিতে পারিতেছেনা; কিন্তু পরিণাম ভাবিয়া তাহার যে রক্ত জল হইয়া যাইতেছে। সে কহিল—"বুড়োর কথাটা এমন করে ঠেলে ফেলিস্‌নে, ভাই। নেহাৎই যদি যেতে চাস তো আর একদিন যাস্‌, আজ নয়।"

"আজই ত সুযোগ জুটেছে। দীপালীর উৎসবে মেতে পাহারা-

ওয়ালারা সব সিদ্ধি খেয়ে বেহুঁস হয়ে পড়েছে, আর রাতটাও দেখছনা কেমন অন্ধকার! এমনটি আর পাওয়া যাবে না।”

গোবর্দ্ধন আর কথা না বলিয়া শয্যার কম্বলখানি ছিঁড়িয়া দুই টুকরা করিয়া জানালার গরাদে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিল, তারপর জানালা গলাইয়া কম্বল ধরিয়া নীচে নামিয়া গেল।

ভৈরব জড়পিণ্ডের মত বসিয়া রহিল। তাহার কথা বলিবার শক্তি লোপ পাইয়াছে, অঙ্গ সঞ্চালনে সে অক্ষম! সে যদি জানিত যে, গোবর্দ্ধন এত চঞ্চল, এমনই ভাবপ্রবণ, তাহা হইলে নিজের দুঃখের কথা কখনো সে তাহাকে জানাইত না। এখনই পাহারাওয়ালারা তাহাদের অনুসন্ধানে আসিবে এবং তাহাকে দেখিতে না পাইয়া মহা অনর্থ সৃষ্টি করিবে।

পাঁচীল টপকাইয়া গোবর্দ্ধন রুদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিল। বহুদিন পরে মুক্ত বায়ুর শীতল স্পর্শ তাহার শরীরে ও মনে পুলক-স্পন্দন আনিয়া দিল। নক্ষত্র-খচিত মুক্তাম্বরের তলে দাঁড়াইয়া সে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিল; কিন্তু সেই জমাটবাঁধা অন্ধকার ভেদ করিয়া কিছুই দেখিতে পাইল না, কেবল দূরের গৃহস্থ কুটীরের ক্ষীণ দীপালোকগুলিই তাহার গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিল। সম্মুখের ওই গ্রামখানি অতিক্রম করিয়া আর একটি ক্ষুদ্র প্রান্তর পার হইলেই নীলুদত্তের বাড়ী গিয়া পৌঁছান যায়। গোবর্দ্ধন দ্রুতপদে অগ্রসর হইল।

লোকালয়ে উপস্থিত হইয়া গোবর্দ্ধন অতি সন্তর্পণে চলিতে লাগিল। পল্লীপথ সন্ধ্যার পরই জনশূন্য হয়, সুতরাং কাহারও সঙ্গে সাক্ষাতের আশঙ্কা ছিলনা; কিন্তু তবুও গোবর্দ্ধন বনপথ ধরিয়া চলিল।

যখন তাহার সুদিন ছিল, তখন কর্ম্মোপলক্ষে সে অনেকবার এই

গ্রামে আসিয়াছে। নীলুদত্তের বাড়ী তাহার ভালরূপেই জানা আছে। সুতরাং পথ ভুল হইবার আশঙ্কা ছিল না।

একটা পুকুরের পার্শ্বে আসিয়া সে ললাটের স্বেদধারা মুছিয়া দাঁড়াইল। এমনই সময় পুষ্করিণীর পরপারে রমণীকণ্ঠের ঝঙ্কার শুনিতে পাইল—"তোকে এখুনি এগুলি ধুয়ে আন্‌তে হবে।"

"কাল খুব সকালে ধুয়ে দেবো, একা আমার বড্ড ভয় করে।"

"নবাবজাদীর মুখের কথা একবার শোন! বলি বাপ যার জেলে থেকে ঘানি টানে, তার আবার অত সোহাগ কিসের? আমারও যেমন পোড়া কপাল!—যত অভাগীকে এনে ঠাঁই দিয়েছি। ভাল চাস তো যা বলছি কর, নইলে ঝেঁটিয়ে বাড়ীর বার করে দেব।"

গোবর্দ্ধন আর কিছুই শুনিতে পাইল না। বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া দেখিতে পাইল ডান হাতে এক বোঝা এঁঠো বাসন আর বাঁ হাতে একটা কেরোসিনের কুপি লইয়া রোগা একটি বালিকা কম্পিতপদে ধীরে ধীরে পুকুরের ঘাটে নামিয়া আসিল।

সন্তানের জননী হইয়া নীলুদত্তের গৃহিনী কোন প্রাণে দশ বছরের এই বালিকাকে একাকিনী এমন অন্ধকার রাত্রিতে পুকুর ঘাটে পাঠাইয়া দিল, গোবর্দ্ধন তাহা বুঝিতে পারিল না।

বালিকা বসিয়া বসিয়া বাসন মাজিতেছিল, আর তাহারই মত শীর্ণ উপেক্ষিত একটি কুকুরের পানে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। এই পরিবারে এই দুইটি প্রাণীর সমানই অবস্থা, তাই ইহাদের মাঝে একটা বন্ধুত্ব জমিয়া উঠিয়াছিল।

ধীরে ধীরে পুষ্করিণীটি প্রদক্ষিণ করিয়া সে বালিকার দিকে অগ্রসর হইল। শুক্‌নো পাতার উপর পায়ের শব্দ শুনিয়া কুকুরটা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া উঠিল—ভীতা বালিকা চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কণ্ঠস্বর

যথাসম্ভব চাপিয়া গোবর্দ্ধন কহিল—"চাঁপা, মা আমায়, একটু দাঁড়া !"

বহুদিন পরে এমন স্নেহের ডাক শুনিয়া চাঁপা বিস্মিত হইয়া প্রদীপটা তুলিয়া ধরিল। তখনো তাহার শরীর থর্ থর্ কাঁপিতেছিল। গোবর্দ্ধন আসিয়া কাছে দাঁড়াইতেই তাহার হাতের প্রদীপটা মাটিতে পড়িয়া নিবিয়া গেল, কণ্ঠ দিয়া একটা অস্ফুট ধ্বনি বাহির হইল। গোবর্দ্ধন ক্ষিপ্রহস্তে তাহাকে টানিয়া লইয়া কহিল—"ভয় কি মা ! আমি তোমার বাবার কাছ থেকেই আসছি। তোমার কুকুরটা আগে সামলাও তো মা !"

বালিকা কহিল বাঘা—"বাঘা ! চুপ কর।"

অসহায়া বালিকাকে যে বুকে টানিয়া লইয়াছে প্রহারের পরিবর্ত্তে যে আদর করিয়াছে, সে যে আপন জন—তাহাই বুঝিতে পারিয়াই যেন বাঘা গোবর্দ্ধনের কাছে গিয়া অঙ্গুলি নাড়িয়া উল্লাস জ্ঞাপন করিল।

গোবর্দ্ধন জিজ্ঞাসা করিল—"তোমায় এরা বড্ড কষ্ট দেয় না ?"

বালিকা কহিল—"হু !"

নীলুদত্তের গৃহিণী শয্যা থেকেই গর্জ্জন করিল—"বলি, ও নবাবজাদি, সারারাত পুকুরে বসে থাকবে নাকি ?"

চাঁপা গোবর্দ্ধনকে কহিল—"তুমি একটুখানি দাঁড়াও, আমি আলোটা ধরিয়ে আনি।"

গোবর্দ্ধন জিজ্ঞাসা করিল—"ভয় কর্‌বে না তো ?"

"বাঃ তুমিই তো রয়েছ"—বলিয়া প্রদীপটা কুড়াইয়া লইয়া চাঁপা গৃহাভিমুখে চলিল। বাঘাও তার অনুগমন করিল।

গোবর্দ্ধন শুনিতে পাইল নীলুদত্তের গৃহিণী কহিতেছে—"এতক্ষণ

"আলোটা পড়ে নিভে গেছে।"

"ওরে দস্যি মেয়ে, সবটা তেল বুঝি ফেলে দিয়েছিস ?"

প্রদীপটা জ্বালাইয়া পুনরায় পুকুর ঘাটে আসিয়া চাঁপা ক্ষিপ্রহস্তে বাসনগুলি ধুইয়া লইয়া কহিল—"আমি এখন যাই। বাবাকে তুমি বলো যে, আমি ভালোই আছি।"

"এখন গিয়ে তুমি কি করবে ?

"আর কাজ নেই, এখন শোব।"

"কোথায় তোমায় শুতে দেয় ?"

"ওদের সঙ্গে এক ঘরেই আমি থাকি, রেতে যখন খুকু কেঁদে ওঠে তখন তাকে রাখতে হয়।"

"দুপুর রেতে কেঁদে উঠলেও খুকীকে তোমায় রাখতে হয় ?

"নইলে মারে যে ! ঘর থেকে বার করে দেয়।" বলিয়া চাঁপা হাসিল, কিন্তু চক্ষু দুটি তার জলে ভরিয়া গেল !

গোবর্দ্ধনের মনে হইল যে, নীলুদত্তকে বলিয়া যায় যে, এই বালিকার প্রতি এমন দুর্ব্যবহার করিলে তাহার মঙ্গল হইবে না, কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে হইল যে, সে কয়েদী,—জেল হইতে পলাইয়া আসিয়াছে।

চাঁপা কহিল—"এখন আমি যাই।"

"আয় মা !" বলিয়া গোবর্দ্ধন তাহাকে বুকে টানিয়া লইল। বাসনের গাদা হাতে লইয়া চাঁপা গৃহে ফিরিয়া গেল। লাঙ্গুল-স্পর্শে বিদায় সম্ভাষণ জানাইয়া বাঘাও তাহার অনুগমন করিল। প্রদীপের শেষ রশ্মিটুকুও যখন অন্ধকারে মিলাইয়া গেল, তখন বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া গোবর্দ্ধন প্রত্যাবর্ত্তন করিল। যে উৎসাহ লইয়া সে প্রান্তরের পর গ্রাম, গ্রামের পর প্রান্তর অতিক্রম করিয়া বন জঙ্গল ভাঙিয়া এখানে

ছুটিয়া আসিয়াছিল, সে উৎসাহ আর নাই। তাহার শরীর যেন লৌহ-দণ্ডের মত দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে!

সে ভাবিতেছিল, পূর্ব্ব জন্মের কোন দুষ্কৃতির ফলে চাঁপা দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। হায়! ভৈরবকে গিয়া সে আজ কি বলিবে? যাহা সে দেখিয়া গেল, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলে বৃদ্ধ যে, দুঃখে পাগল হইয়া যাইবে। বেদনার লাঘব হইবে মনে করিয়া সে চাঁপাকে দেখিতে আসিয়াছিল, কিন্তু যে আঘাত বুকে লইয়া সে ফিরিয়া চলিল, মুক্তির পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সেই ব্যথা তাহার হৃৎপিণ্ডটাকে দলিয়া পিষিয়া ফেলিবে।

গোবর্দ্ধন আসিয়া যখন কারা-প্রাচীরের বাহিরে দাঁড়াইল, তখন প্রহরী-পরিবর্ত্তনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। কিছুকাল নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অতি সন্তর্পণে প্রাচীরের উপর উঠিল। কিন্তু ভিতরে ও কিসের কোলাহল? গোবর্দ্ধন উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল। এ যে তাহারই ঘরের দিকে! অনেকগুলি লোক একত্র মিলিত হইয়া কাহাকে যেন বিষম প্রহার করিতেছে। সহসা ভৈরবের আর্ত্তনাদ সে শুনিতে পাইল। ভৈরব কহিতেছিল—"আর আমায় মেরনা। সে পালায়নি, আবার ফিরে আসবে।"

গোবর্দ্ধনের হাত পা আড়ষ্ট হইয়া গেল। চোখের সামনে সে যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল, প্রহরীগণ উল্লাস-ধ্বনি করিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, জমাদার রোষ-রক্তিম নয়নে তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছে। উঃ! সে যাতনা সে সহ্য করিতে পারিবে না। দয়ামায়া-হীন এই সব প্রহরী সামান্য অপরাধে কয়েদীদের যে নির্ম্মম প্রহার করে, তাহা সে নিজে অনেকবার দেখিয়াছে। গোবর্দ্ধন একবার পিছনে ফিরিয়া চাহিল—তারপর যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথেই পলাইবার উপক্রম

করিল। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে সে আবার ভৈরবের যাতনা-কাতর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল। তীব্র কশাঘাতের ব্যথার মত সে একটা জ্বালাময়ী বেদনা অনুভব করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। ছিঃ, ছিঃ! সে এতই ঘৃণ্য, এমনই জঘন্য হইয়া উঠিয়াছে যে, নিজের অপরাধের বোঝা নির্দ্দোষ বৃদ্ধের স্কন্ধে চাপাইয়া তাহাকে অত্যাচারের অনলকুণ্ডে ফেলিয়া সে পলায়নের আয়োজন করিতেছে! না, না কিছুতেই সে এই জঘন্য প্রবৃত্তিকে তাহার উপর প্রভুত্ব করিতে দিবে না। গোবর্দ্ধন কারাগারের মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে গিয়া নিজ কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইল।

প্রহরীগণ তখন ভৈরবের পিঠের নীচে ও বুকের উপর দুইখানা বাঁশ রাখিয়া উৎকট শাস্তির ব্যবস্থা করিতেছিল। গোবর্দ্ধন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"খবরদার! ওকে শাস্তি দিয়ো না—সম্পূর্ণ নিরপরাধ ও।"

ভৈরবকে ছাড়িয়া তখন সকলে মিলিয়া গোবর্দ্ধনকে প্রহার করিতে করিতে কারাধ্যক্ষের নিকট লইয়া গেল। পরদিন বিচারকের নিকট গোবর্দ্ধন অকপটে সকল কথা খুলিয়া বলিল। ফলে তাহার দণ্ডভোগের কাল আবার বাড়িয়া গেল।

সংবাদ পত্রে এই কাহিনী পাঠ করিয়া সতীশের চিত্তে অজ্ঞাত এই লোকটি এবং অপরিচিতা, উৎপীড়িতা এই বালিকার প্রতি সহানুভূতি জাগিয়া উঠিল। যে রকমেই হউক সে এই বালিকার উদ্ধার-সাধন করিয়া তাহার পিতার কারামুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত নিজের গৃহে [illegible] পালন করিবে। ভৈরবের সহিত দেখা করিয়া তাহার সম্মতি লইতে তাহার বেশি ক্লেশ হইল না; কিন্তু নীলু দত্ত বিনা বেতনের এই পরিচারিকাটিকে মুক্তি দিতে একেবারেই নারাজ। অবশেষে ম্যাজিষ্ট্রেট

প্রাণ প্রতিষ্ঠা

সাহেবকে সমস্ত বুঝাইয়া বলিয়া সতীশ তাহার সাহায্যে চাঁপাকে মুক্ত করিয়া লইয়া গৃহে ফিরিল।

ভৈরবের নিকট গোবর্দ্ধনের পরিচয় পাইয়া সতীশ জানিতে পারিল যে, সে হেমেন্দ্রলালেরই প্রজা। এতবড় অত্যাচার করিয়া হেমেন্দ্র একটা দরিদ্র পরিবারের সুখ শান্তি সমস্তই নষ্ট করিয়াছে, অথচ কমল তাহাকে কিছুই বলে নাই! সে নিশ্চিতই এ সম্বন্ধে কিছুই জানে না। কমলের জ্ঞাতসারে এমন অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতে পারে না—আর হইলেও প্রতিকার কামনা করিয়া কমল তাহাকে সমস্ত ঘটনা না জানাইয়া কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিত না।

সতীশের আর একটা নূতন কাজ জুটিয়া গেল। গোবর্দ্ধনের স্ত্রী পুত্রের সন্ধান করিয়া তাহাদের সুখ-শান্তির বিধান করিতে হইবেই—নইলে তাহার ব্রত উদ্‌যাপন হইবে না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সকালে উঠিয়া সতীশ দেখিল পুর্ব্ব প্রতিশ্রুতি মত বাছের সর্দ্দার আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহাকে সেলাম করিয়া বাছের কহিল—"বাবু চলুন। ফিরতে বেলা পড়ে যাবে।" সতীশ জামা কাপড় লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

কৃষকেরা তখন মাঠে কাজ সুরু করিয়াছে। বাছের কহিল—"দেখচেন বাবু, গরুগুলোর তুর্দ্দশা। সারাদিন পরিশ্রম করে, তারপর আবার খেতে পায় না। হাড় ক'খানা আঙ্গুল দিয়ে গণে নেওয়া যায়।"

সতীশ দেখিল গরুগুলো চোখ বুজিয়া অতি কষ্টে কাঁধের বোঝা টানিয়া লইতেছে। মাতা বসুমতীর মতই সহিষ্ণু তাহারা। তাড়না গঞ্জনা সবই সহ্য করিয়া প্রভুর কাজে প্রাণপাত করিতেছে। বেচারা কৃষকদেরই বা দোষ কি? তাহারা নিজেরাওত দু'বেলা খাইতে পায় না, দিনের পর দিন এক জোড়া গরু দিয়াইত তাহাদের সকল কাজ চালাইতে হয়!

ক্রমে প্রান্তর অতিক্রম করিয়া তাহারা একটি কৃষক পল্লীতে উপস্থিত হইল। গৃহের চালে খড় নাই, আঙিনার পাশেই শৈবাল-পূর্ণ বদ্ধ ডোবা, স্ফীতোদর শিশুর দল কলের পুতুলের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাদের হলুদ বর্ণ চোখে শিশুর চাঞ্চল্য নেই, মুখে হাসি নেই, হয়ত বা উদরে অন্নেরও অভাব! কুম্ভকারের-পল্লীর ঘরে ঘরে কুম্ভকারেরা চাকে কাজ করিতেছিল। সতীশ তাহাদের কারু মুখে এতটুকু উৎসাহের বা স্বাস্থ্যের চিহ্ন খুঁজিয়া পাইল না। অতিরিক্ত বোঝাই গাড়ীর গরুগুলি যেমন চালকের-কশাঘাতে বিচলিত না হইয়া চোখ বুজিয়া তাদের অক্লান্ত-

প্রায় পথের সবটুকু মাটি মাড়াইয়া মন্থর গতিতে অগ্রসর হয়, তেমনি এরা সব দুর্ব্বহ জীবনের বোঝা টানিয়া অতিকষ্টের দিনগুলি কোনমতে কাটাইয়া দিতেছে।

সতীশ ভাবিল হায়! বিনোদকে যদি সে এসব দেখাইতে পারিত, তাহা হইলে বুঝাইয়া দিত মাতৃ–সেবকের কর্ত্তব্য কি! এই দারিদ্র্যক্লিষ্ট, রোগজর্জ্জরিত, অশান্তির অনলে দগ্ধ কোটী কোটী লোকের অশ্রু মুছাইতে না পারিলে, তাঁহাদের নিরানন্দ গৃহে উৎসবের আলো জ্বালিয়া না দিলে মায়ের মুখে হাসি ফুটিবে না, দেশ-পূজার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইবে।

সত্য আজ বাঙালীর চিত্ত পল্লীর দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। পল্লীর হিতসাধন কল্পে আজ শিক্ষিত লোকের চেষ্টা ও যত্ন দেখা যাইতেছে। কিন্তু তাহাও কেবল শিক্ষিত ভদ্রলোকেরই উপকারের জন্য। সতীশদের গ্রামে শিক্ষিত লোকের সংখ্যাই অধিক, তাই তাহাদের ছেলে মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থার জন্য পাঠশালা ও ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, গ্রামবাসীর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য তিনটা রিজার্ভড্ ট্যাঙ্ক খনিত হইয়াছে। কিন্তু সে যে সমগ্র একটি কৃষকপল্লী অতিক্রম করিয়া চলিল, তাহার মাঝে পানীয় জলের একটি পুষ্করিণীও তো সে দেখিতে পাইল না, শিক্ষার প্রতিষ্ঠান তো দূরের কথা! তাদের গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। গ্রামের রায় বাহাদুর হইতে শুরু করিয়া সঙ্গতিসম্পন্ন সকল গৃহস্থই বিনাব্যয়ে সেখান থেকে ঔষধ পাইয়া থাকেন, অথচ এই কপর্দ্দকহীন কৃষকগণ বিনা ঔষধে দলে দলে প্রাণত্যাগ করিতেছে! হতভাগ্য ইহারা মুখ ফুটিয়া ব্যথার কথা প্রকাশ করিতে পারে না। এমন কি, অভিযোগ করিবার যথেষ্ট কারণ যে বর্ত্তমান, এ কথাও তাহাদের একটিবারও মনে হয় না। জন্ম হইতে তাহারা শুনিয়া আসিতেছে তাহাদিগকে এমন করিয়াই থাকিতে হইবে।

দেশের লোকের উপর তাহাদেরও যে একটা দাবী রহিয়াছে—তাহাদের প্রাণান্ত পরিশ্রমলব্ধ অর্থের দ্বারাই যে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকের সর্ব্ববিধ সুখ ও সুবিধার ব্যবস্থা হইয়াছে একথাটা তাহাদিগকেও যেমন বুঝাইয়া দিতে হইবে, শিক্ষিত লোকদেরও, তাহা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে।

সতীশ মনে করিল, সে জীবনের ঠিক পথই বাছিয়া লইয়াছে। নিজে কৃষি ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া তবে সে কৃষকদিগকে উন্নতির চেষ্টা করিবে।

গ্রাম অতিক্রম করিয়া পুনরায় তাহারা প্রান্তরের মাঝে আসিয়া পড়িয়াছে। সতীশ কহিল—"বাছের, তোমার মত কটি লোকের সাহায্য পেলে খুব তাড়াতাড়ি আমি একজন পাকা চাষী হতে পারতুম।"

বাছের উত্তর করিল—"আজ্ঞে বাবু, গোবর্দ্ধনের উপর জমিদারের অত্যাচার দেখে মনে করেছিলাম যে, বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করে চলে যাব। কিন্তু, তা কি পারি বাবু? যে ক'টা দিন আছি, সেই মাটির উপরই পড়ে থাকব।"

সতীশ কহিল—"না বাছের, দেশ ত্যাগ তোমাদের করতে হবে না। ভগবানের ইচ্ছায় হেমেন্দ্রের স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটবে—তোমাদের সুখ দুঃখের কথা সেও একদিন বিবেচনা করে দেখবে।"

"আহা! তাই হোক বাবু, তাই হোক। খোদাতাল্লা তাঁকে সুমতি দিন। মনিব যদি প্রজার উপর অত্যাচার করেন, প্রজাকে পায়ে ঠেলে ফেলেন, তা হলেই কি প্রজা পারে মনিবকে অমান্য করতে! বাস্তুদেবের অবমাননা যে মহাপাতকের কাজ বাবু।"

সতীশের চলিতে কষ্ট হইতেছিল। বাছের তাহা লক্ষ্য করিয়া

কহিল—"বাবু একটু বিশ্রাম করে নিন! এই মাঠখানা পাড়ি দিতে পারলেই আমরা সেই গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছিব।" প্রায় ঘণ্টা খানেক হইল তাহারা এই মাঠের ভিতর দিয়া চলিয়াছে, কিন্তু তবুও ত পরের গ্রামের রেখাটিও দেখা যাইতেছে না।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তাহারা একটা আমগাছের নীচে বসিল। বাছের কহিল—"জুতা জোড়া খুলে ফেলুন বাবু, বেশ ঠাণ্ডা বোধ হবে।"

কয়েকটি কৃষকও সেইখানে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল—বাছের তাহাদের সহিত আলাপ স্থরু করিল। একজন তাহার হাতের কল্কেটি কাপড়ে মুছিয়া লইয়া কহিল—"খান বাবু।" সতীশ জানাইল যে, সে তামাক খায় না। বাছের কল্কেটি লইয়া ধান চাউলের দর, গত ফসল তাহাদের কিরূপ হইয়াছিল প্রভৃতি কৃষি বিষয়ক নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিল। সতীশ মনোযোগের সহিত তাহা শুনিতেছিল। সতীশ দেখিল ইহারা নিরক্ষর সত্য, কিন্তু মূর্খ ত নয়। মানুষের দল ইহাদিগকে তুচ্ছ করিয়া লেখাপড়া শিখাইবার কোন ব্যবস্থা করে নাই, কিন্তু প্রকৃতি আপন জ্ঞানের পুস্তক খানি ইহাদের সামনে খুলিয়া রাখিয়াছেন! সে জ্ঞান লাভ করিতে ছাপার হরফের সহিত পরিচয়ের আবশ্যক হয়না—যে টুকু বুদ্ধির প্রয়োজন, ভগবান ইহাদিগকে তাহা হইতে বঞ্চিত করেন নাই!

পরিচয়ে সতীশ জানিল যে, এই কৃষকগণ গোবর্দ্ধনের শ্বশুর বাড়ীর গাঁয়ের লোক। আগন্তুক দুইটি গোবর্দ্ধনের শ্বশুর বাটী যাইতেছেন শুনিয়া কৃষকদিগের মধ্যে একজন কহিল—"সে বাড়ী গিয়ে এখন আর কি দেখবেন, বাবু! ছেলেবেলায় আমরাই কি দেখেছি। ষোল যোড়া হাল চলত, দিনে কম করেও চল্লিশ জন লোক ক্ষেতে খামারে

কাজ করত। আমাদের গাঁয়ে এমন খুব কম লোক্ই আছে যে, কোন দিনে সে বাড়ী পাত পাতে নি। বুড়ো বোস মরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ীতে কি অলক্ষ্মীই ঢুকল—ভেয়ে ভেয়ে ঝগড়া হল—ক্ষেত খামার সবই নষ্ট হয়ে গেল! বুড়ো তার একটি মাত্র মেয়েকে ভালঘরে ভাল বরে বিয়ে দিয়েছিল। আমাদের এ তল্লাটে বাবু, এমন লক্ষ্মী মেয়ে আর একটি দেখিনি—শুনেছি সে নাকি লিখতে পড়তেও জানত। হ'লে কি হয় বাবু, অদৃষ্ট তার বড়ই মন্দ। স্বামীটি তার জমীদারকে মেরে জেলে গিয়েছে। শ্বশুরের ঘরে আর কেউ নেই বলে মেয়েটি এসে ভাইদের কাছে আশ্রয় চাইল। দু'ভাইত স্পষ্ট বলেই দিল—তারা বোঝা টানতে পারবে না! বাবু, আপন মায়ের পেটের ভাই এরা! ছোট ভাইটির বৌ বড্ড চালাক! সে দেখলে বিনা পয়সায় এমন চাকরাণী আর পাওয়া যাবে না—তাই সে ননদকে রাখতে রাজী হল। মা আর ছেলেকে দু'বেলা দুমুঠো খেতে দিয়ে দাসীর মত খাটিয়ে নিত। বাবু, তোমাদের ভদ্দর লোকের মধ্যে যারা ভাল, খুবই ভাল তারা—আর যারা মন্দ, তারা আমাদের চাইতেও মন্দ।

বাছের জিজ্ঞাসা করিল—"সেই মেয়েটি আর তার ছেলে কেমন আছে জান?"

"তাইত বলছিলাম, গো,—ভদ্দর লোকের কথা কওয়া যায় না। এখানে আসা অবধি ছেলেটা জরে ভুগছিল, হাত পা কাঠির মত হয়ে গেছিল। আমরা যে দুবেলা খেতে পাইনা, আমরাও বাবু ব্যায়ারাম এমন সঙ্গীন হলে, ঘটী বাটী বাঁধা দিয়েও কবরেজের বড়ী এনে খাওয়াই। ছেলেটা বিনা চিকিৎসায় মরে গেল!"

বাছের সর্দ্দার চীৎকার করিয়া বলিল—"কি! গোবর্দ্ধনের ছেলে গোপাল নেই!" তারপর সতীশের দিকে ফিরিয়া কহিল—"বাবু,

আমি আর যেতে পারব না। বেটী আমার যেতে চেয়েছিল না, তবু জোর করে আমি তাকে রেখে এসেছিলাম। গোবর্দ্ধন ফিরে এলে, তাকে কি বলব বাবু!" বালকের মত ফুলিয়া ফুলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

অতি কষ্টে কান্না চাপিয়া সতীশ কহিল—"এতদূর এসে ফিরে যাবে বাছের? পুত্রহারা অভাগীকে সান্ত্বনাও দিয়ে যাবে না?"

কিছুকাল নীরব থাকিয়া বাছের উত্তর করিল—"না বাবু, এসেছি যদি—দেখা করে যাবই। আর পারিত মাকে নিয়ে যাব। এখানে থাকলে সেও বাঁচবে না।"

উপস্থিত কৃষকগণ এই আগন্তুকদ্বয়ের উদার হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইল। সতীশকে সম্বোধন করিয়া একজন কহিল—"বাবু, আপনারা?"

"আমি ব্রাহ্মণ—আর সঙ্গেই এই সর্দ্দার মুসলমান। 'প্রণাম হই' বলিয়া একে একে সমবেত কৃষককুল সতীশকে করযোড়ে প্রণাম করিল এবং বাছেরকে সেলাম জানাইল। তারপর একজন অতি বিনীত ভাবে বলিল—"বাবু, আমাদের একটা নিবেদন আছে—বলতে সাহস হচ্ছে না।"

সতীশ কহিল—"কি বলতে চাও, বল।"

"বাবু, আমরা কৈবর্ত্ত চাষী। এতবেলায় আপনারা সে বাড়ীতে না গিয়ে, এই গরীবের দুয়ারে পদধুলি দিয়ে চারটি রেঁধে যদি আমাদের প্রসাদ দেন!" বলিয়া সে হাতযোড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তাদের চোখে মুখে সতীশ এমন একটা ভাবের পরিচয় পাইল যে, সে সম্মতি না দিয়া থাকিতে পারিল না। কৃষকদিগের মধ্যে একজন তাহাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। সতীশ ও বাছের উভয়েই নিজ

নিজ চিন্তায় মগ্ন ছিল। বাছের ভাবিতেছিল কেন সে মালতীকে এখানে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাখিয়া গিয়াছিল আর সতীশ ভাবিতেছিল হেমেন্দ্র লালের কথা। পুত্রশোকাতুরা জননীর দীর্ঘশ্বাস ও উষ্ণ অশ্রুবিন্দু তাহার কি অনিষ্টই সাধন করিবে।

দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেলে তাহারা মদন কৈবর্ত্তের বাটী আসিয়া পৌছিল। মদন তাড়াতাড়ি করিয়া একটা ছিন্ন মাদুর বিছাইয়া তাহাদের বসিতে বলিয়া বাটীর পিছনের ডোবা হইতে পা ধুইবার জল আনিয়া দিল। একটি ছোট ছেলে আসিয়া তামাক সাজিয়া দিল। মদন দুইটা ডাব আনিয়া কহিল—"হাত পা ধুয়ে একটু জল খেয়ে নিন।" মদনের স্ত্রী আঙিনার এক কোণ পরিষ্কার করিয়া একটা উনুন খুঁড়িয়া রান্নার আয়োজন করিয়া দিল—লাল মোটা চাউল, ক'টা বেগুন আর কাঁচকলা।

স্নানান্তে সতীশ রান্না চাপাইয়া দিল। দূরে বসিয়া মদন কহিল—"আপনারা বাবু কত কি দিয়ে খাও, আমাদের ঘরে সে সব কিছু থাকে না। মাছত মেলেই না বাবু, আর দুধটুকুও সকলে বেচতে নিয়ে গেছে।"

সতীশ কহিল—"এতেই বেশ হবে মদন, তুমি ব্যস্ত হয়ো না।'

"পেট ভরলেই হয়" বলিয়া মদন হাসিল।

সেদিন এই কৈবর্ত্তের বাড়ীতে আহার করিয়া সতীশ যে তৃপ্তি পাইল, জীবনে তেমনটি আর কখনো পায় নাই। মনে মনে সে কহিল —"এই জন্যই বুঝি বিশ্বের ঠাকুরও বিদুরের ক্ষুদকণার জন্য এত লালায়িত ছিলেন।"

আহারান্তে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া বাছের সতীশকে গোবর্দ্ধনের শ্বশুর বাড়ী লইয়া গেল। বাড়ীটি দেখিয়াই মনে হয় পূর্ব্বে ইহা বেশ

শ্রীসম্পন্ন ছিল, কিন্তু এক্ষণে ঘরের চাল খসিয়া পড়িতেছে—আঙিনার পার্শ্বে ধানের গোলাগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—বাড়ীর সম্মুখের পুষ্করিণী কল্‌মি লতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহাদিগকে বাড়ী প্রবেশ করিতে দেখিয়া একটি শীর্ণকায় যুবক বাহির হইয়া আসিল। তাহার গায়ে একটি ময়লা জাপানী গেঞ্জি—চুলগুলি কলিকাতার গাড়োয়ানদের অনুকরণে ছাঁটা। সে জিজ্ঞাসা করিল—"কি চাই?" এবং পরক্ষণেই বাছেরকে চিনিতে পারিয়া কহিল—"তুমি না মালতীর শ্বশুরবাড়ীর গাঁয়ের লোক!"

বাছের উত্তর করিল—"হাঁ, আমিই তাকে এখানে রেখে গিয়েছিলাম।"

যুবক প্রশ্ন করিল—"আবার কি মনে করে আসা হয়েছে?"

"একবার তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"কেন?

"সে তাকেই বলব।"

যুবক নিজেকে অপমানিত মনে করিল। সে কহিল—"তুমিত বড় ত্যাড়া ত্যাড়া কথা বলহে!"

সতীশ মৃদুস্বরে কহিল—"এমন অন্যায় কথাও কিছু বলেনি। গোবর্দ্ধনের স্ত্রীকে ও যা বলতে চায়, আপনার সামনেই তা বলবে।"

উদ্ধতভাবে যুবক কহিল—"তা ত বলবেই মশাই। কিন্তু আমার বোন কি জন্য একটা মূর্খ চাষার সঙ্গে দেখা করবে?"

সতীশ বলিল—"আপনার ভগ্নী একে বাপের মত শ্রদ্ধা করেন।"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া যুবক কহিল—"না মশাই, তারি সঙ্গে দেখা হবে না! সে আজ দশ বার দিন বিছানায় পড়ে আছে—উঠবার ক্ষমতা নাই।"

বাছের সর্দ্দারের সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। সজলচক্ষে সে কহিল —"যা বলেছিলাম বাবু; এখানে থাকলে সে বাঁচবে না।"

সতীশ অতি ধীরভাবে যুবককে বুঝাইয়া বলিল যে, গোবর্দ্ধন জেলে যাইবার সময় বার বার করিয়া বলিয়া গিয়াছে, সেখানে প্রবেশ করিবার অধিকার বাছের এখনও পায় নাই; কিন্তু মালতীর সংবাদ একবার সে জানিতে চায়।

যুবক কি উত্তর দিবে, ভাবিয়া তাহা স্থির করিতে না পারিয়া কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বাটীর ভিতর চলিয়া গেল।

বাছের কহিল—"আপনাকে সঙ্গে এনে শুধু কষ্টই দিলাম, বাবু। লোকটা বসতেও কইল না।"

যুবক অল্পকাল পরেই ফিরিয়া আসিয়া বাছেরকে ডাকিয়া লইয়া গেল। সতীশ একটা গাছের গুঁড়ির উপর বসিয়া রহিল।

যুবকের সঙ্গে গিয়া বাছের একখানি মেটে ঘরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল—ভিতরে এমন অন্ধকার যে ভাল করিয়া সে কিছুই দেখিতে পাইল না। একটু অপেক্ষা করার পর সে দেখিতে পাইল যে একখানা তক্তপোষের উপর ছিন্ন মলিন শয্যায় মালতী শুইয়া রহিয়াছে। তাহার পাণ্ডুর মুখখানি দেখিয়া বাছের সর্দ্দার বড়ই ব্যথা পাইল! হায়! এই কয় মাসে সে কি হইয়া গিয়াছে।

মালতী বাছেরকে দেখিতে পাইয়া অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। পুত্রহারা জননীকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা খুঁজিয়া না পাইয়া বাছের নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার শ্বেতশ্মশ্রু বহিয়া বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল। বহুক্ষণ পরে বাছের কহিল—"কেঁদে আর কি করবি মা! খোদার ধন, খোদাই নিয়েছেন।"

কাঁদিয়া মালতী কহিল—"সর্দ্দার, কেন আমায় এখানে রেখে গিয়েছিলে? সেখানে থাকলে হয়ত বাছাকে হারাতাম না।"

"ও কথা বলে আর আমায় দগ্ধ করিস নে মা!—গোবর্দ্ধনকে আমি কি বলব?"

মালতী ধীরে ধীরে উঠিয়া দরজার কাছে আসিয়া একটু আড়ালে বসিল এবং ভ্রাতাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—"বস্‌তে একখানা আসনও দাও নি?"

বাছের কহিল—"বাবু রয়েছেন বাইরে দাঁড়িয়ে—আমিই বা আর বসব কেন?" সে মাটিতে বসিয়া সতীশের পরিচয় দিয়া তাহাদের এখানে আসিবার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়া কহিল—"চল্ মা, আবার তোর ঘরে ফিরে চল্—এখানে থাক্‌লে বাঁচবি নে তুই।"

"এখন আর কেন সর্দ্দার! গেলে যাকে বাঁচাতে পারতাম সে ত চলেই গেছে!" বলিয়া মালতী অঞ্চলে অশ্রু মুছিল।

বাছের কহিল—"তার যে অসুখ হয়েছিল, একখানা চিঠি দিয়ে ত আমায় জানাতে পারতিস্ মা।"

"চেষ্টা আমি করেছিলাম, কিন্তু পারি নি।"

চিঠি লিখতে চেষ্টা করিয়াও কেন যে সে পারে নাই, প্রথমে তাহা বাছের বুঝিতে পারিল না। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সে মালতীর ভ্রাতার দিকে চাহিল, যুবক মাথা নীচু করিল। বাছের বুঝিল যে ইহারাই বাধা দিয়াছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল—

"তবু এখানে থাক্‌বি মা?"

"কোথায় আর যাব সর্দ্দার!"

"কেন সতীশ বাবুর বাড়ীতেই চল! তাঁর মা, বাপ, স্ত্রী, বোন সবাই তোকে আদরে রাখবেন। তারপর গোবর্দ্ধন ফিরে এলে ঘরের

লক্ষ্মী তুই ঘরে ফিরে যাস্। সতীশবাবু আরও একটি মেয়েকে আশ্রয় দিয়েছেন—চল্ মা, আমার সঙ্গে চল। তোর শরীর যে একেবারে ভেঙে গেছে !"

"না সর্দ্দার, আমি যেতে পারব না।" বাছের কত করিয়া বুঝাইল, কিন্তু মালতী কিছুতেই যাইতে সম্মত হইল না। অবশেষে বাছের তাহার নিকট বিদায় লইয়া ধীরপদবিক্ষেপে অগ্রসর হইল। দুই চারি পদ চলিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঘরের ভিতর হইতে বামাকণ্ঠে কে যেন বলিতেছিল—"তা যাবে কেন ? আমাদের হাড়মাস চিবিয়ে খেয়ে তবে ত নামবেন। কেন গা ! তোমার এত সব দরদী লোক রয়েচে, তুমি কেন গরীবের বুকে পা দিয়ে বসবে !"

বাছের ফিরিল। মালতীর ঘরের কাছে গিয়া কহিল—"যেতে ত পারলাম না, মা !" মালতী বুঝিল যে, বাছের তাহার ভ্রাতৃ-জায়ার পরুষবাক্য শুনিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সত্য বটে এ বাটীতে তাহার আর মুহূর্ত্তকাল থাকিতে ইচ্ছা হয় না ! কিন্তু কোথায় সে যাইবে ? আজ তাহার ভ্রাতৃ-জায়া তাহার সহিত দুর্ব্যবহার করিতেছে, কিন্তু তবুওত আপনার লোক সে। পরের ঘরে যদি কেহ তাহাকে তুচ্ছ করে, ঘৃণা করে, তাহা হইলে সে বেদনা যে আরো অসহ্য হইয়া উঠিবে।

মালতী কহিল—"সর্দ্দার, তুমি দুঃখিত হয়োনা ! ভেবে দেখ, পরের গলগ্রহ হয়ে থাকা কি কঠিন !"

বাছের দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি যেন ভাবিল, তারপর কহিল—"বেশ তবে নাই গেলি তুই ! যদি কখনো দরকার হয়, এ বুড়োকে খবর দিস্। এখন তবে আসি মা।"

বাহিরে আসিয়া বাছের সতীশকে কহিল—"চলুন বাবু।" তাহার জলভরা চোখ দেখিয়া সতীশ বুঝিল যে মালতী আসিতে সম্মত হয় নাই।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া সতীশ প্রথম কটা দিন কেবল সহরময় ঘুরিয়াই বেড়াইল। মেসে থাকিয়া যখন সে কলেজে পড়িত তখন দু'দিনের ছুটী পাইলেই পল্লী-মায়ের কোলে ফিরিয়া যাইবার জন্য সে ব্যাকুল হইয়া উঠিত। কিন্তু এবার দীর্ঘকাল কলিকাতা ছাড়িয়া থাকিবার ফলে, এই মহানগরীর কর্ম্মচাঞ্চল্য তাহার অনেকটা ভাল লাগিল আর তার সঙ্গে ছিল অতীতের একটা সুখ-স্মৃতির আকর্ষণ। গোলদীঘির ওই সীমাবদ্ধ স্থানটুকুর মাঝে সঙ্গীদের সহিত তর্ক করিতে করিতে বার বার ঘুরিয়া বেড়াইবার মাঝে যে একটু বিশেষ রকমের আমোদ ছিল—মেসের ছাতে গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় যে মধুর মজলিস জমিয়া উঠিত—টাউন হলে, রামমোহন লাইব্রেরীতে, বিডন উদ্যানে ও ব্রাহ্ম সমাজে বক্তৃতা শুনিবার জন্য ভিড় ঠেলিয়া নির্য্যাতন সহিয়াও যে তৃপ্তিটুকু লইয়া গৃহে ফিরিত—সেই আনন্দ সেই তৃপ্তি, সুখ-সম্মিলনের সেই মধুর স্মৃতিই কলিকাতার প্রতি তার একটা আন্তরিক টান জাগাইয়া তুলিয়াছে।

এক বৎসরের মাঝেই কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে বাংলার এই শ্রেষ্ঠ নগরীর!

ঐ যে স্থানে সে দরিদ্রের কুটীরগুলি দেখিয়াছিল—পরিজনবর্গসহ সহায়-সম্পদ-হীন কত গৃহস্থ পরিবার কোন মতে মাথাটুকু গুঁজিবার ঠাঁই করিয়া লইয়া জীবন-সংগ্রামের কঠোরতার সহিত অবিরাম যুদ্ধ করিতেছিল—আজ সেই দরিদ্রভবনগুলি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া ভূপৃষ্ঠ হইতে তাহাদের চিহ্ন পর্য্যন্ত মুছিয়া ফেলিয়া ঐশ্বর্য্য-গর্ব্ব-স্ফীত, নব-

নির্ম্মিত হর্ম্ম্যরাজী আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। অপরাহ্নে মাণিকতলার খালের কুলে যে জায়গাটিতে বসিয়া তাহারা চীনাবাদামের খোসা ছাড়াইতে ছাড়াইতে নগরীর কোলাহল ভুলিয়া সুখ-প্রসঙ্গে মগ্ন থাকিত, সদ্যঃপ্রতিষ্ঠিত লৌহ কারখানার ঘর্ঘর ধ্বনি আজ সে স্থানের শান্তিভঙ্গ করিতেছে। আজ গঙ্গার তীরে জেটীর প্রসার হইয়াছে—নিজের সম্পদ সামলাইতে না পারিয়া রাজধানী কলিকাতা নগরোপকণ্ঠের শ্যামশোভা বিধ্বস্ত করিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠায় উদ্যত হইয়াছে।

অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানের এই চিত্র মিলাইয়া দেখিয়া সতীশ বড়ই একটা বেদনা অনুভব করিল।

সেদিন সতীশ ট্রামে চড়িয়া যাইতেছিল। বহুবাজারের মোড়ে সাহেবী পোষাক-পরিহিত জনৈক বাঙালী গাড়ীতে উঠিয়া তাহাকে দেখিতে পাইয়া কহিল—"হ্যালো! সতীশ যে!"

বিস্ময় প্রকাশ করিয়া সতীশ বলিল—"বাঃ, তুমি কবে এলে, সুধীর?"

"দু মাসের কিছু বেশী হবে।"

"দু মাস! তবে দেখচি, আমাদের একেবারে ভুলেই গেছ!"

"হাঁ, তা বৈকি?"

"না, এ কথা আর অস্বীকার করা চলচে না। দেশে ফিরে একখানা চিঠি দিয়েও ত জানাতে পারতে।"

"আর তুমিও ত কলিকাতায় এসেচ, অথচ একটিবার আমাদের বাড়ীতে গিয়ে খোঁজও নাও নি যে সাত সমুদ্দুর পারে গিয়ে ক্ষীণ এই বঙ্গসন্তানটি বেঁচে আছে, কি মরে গেছে!"

সতীশ কহিল—"সত্যি বলচি সুধীর, তোমার আগমন আমি সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলুম।"

"আমার এত সৌভাগ্যের কারণটা কি সতীশ ?"

"প্রয়োজন আছে। তুমি এখন করচ কি ?"

"ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার।"

"ব্যাঙ্কের ম্যানেজার !"

"বিস্মিত হলে সতীশ ?"

"একটু ধাঁধাইত লাগচে ভাই ! তুমি না কৃষি শিক্ষার জন্য আমেরিকায় গিয়াছিলে ?"

"ওঃ সে অনেক কথা। তুমি এখন যাচ্ছ কোথায় ?"

"নিউম্যানের বাড়ীতে। ক'খানা বই কিনতে হবে।"

"বেশত, লালবাজারেই আমার আফিস—চল সেখানে বসে একটু গল্প করিগে। কতদিন পর দেখা হল।"

সুধীর সতীশের সঙ্গেই প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িত। বি, এস্, সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তাহার পিতা আনন্দমোহন বাবু কৃষি শিক্ষার জন্য তাহাকে আমেরিকায় পাঠান। আনন্দমোহন বাবু সেক্রেটারিয়েট চাকরী করিতেন, এখন পেন্সন লইয়া কলিকাতায় থাকেন। সুধীর ও তাহার কনিষ্ঠ ভগিনী গায়ত্রী ছোট থাকিতেই আনন্দমোহনের সহধর্ম্মিনী ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

আনন্দমোহন সতীশের স্বগ্রামবাসী। কেশবচন্দ্র যখন নববিধান প্রতিষ্ঠা করেন, আনন্দমোহন তখন ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। একমাত্র পুত্রকে স্বধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে দেখিয়া আনন্দমোহনের পিতামাতা সংসার ত্যাগ করিয়া কাশীধামে চলিয়া যান—জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাহারা পুত্রকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই। আনন্দমোহনও আর কখনো দেশে ফিরিয়া যান নাই। একখানি

সুখ-স্মৃতি চিত্ত হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারেন নাই—ভুলিতে পারেন নাই সেই দেশ-মাতৃকাকে, কৈশোরে যার কোলে তিনি ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেন—যৌবনে মুগ্ধ হইয়া দেখিতেন যার শ্যামস্নিগ্ধ মূর্ত্তি !

তাই সতীশ যখন কলিকাতায় কলেজে পড়িতে গিয়াছিল, আনন্দ মোহন আগ্রহ সহকারে তাহাকে ডাকিয়া জন্মভূমি সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। স্বদেশবৎসল এই যুবক আনন্দমোহনের দেশপ্রীতির পরিচয় পাইয়া তাহার অনুরক্ত হইয়া উঠিল। ক্রমে-বৃদ্ধ ও যুবকের মাঝে একটা নূতন রকমের ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইল।

সুধীর আমেরিকায় চলিয়া যাইবার পর আনন্দমোহন গায়ত্রীকে বোর্ডিংয়ে রাখিয়া দেশভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িলেন। সতীশ পরীক্ষা দিয়া যখন বাড়ী যায়, আনন্দমোহন তখনো কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই।

আমেরিকায় থাকিতে সুধীর প্রথম কিছুদিন সতীশকে রীতিমত পত্র লিখিত—কিন্তু ক্রমে তাহা বন্ধ করিয়া দিল। সুধীরদের পরিবারের সঙ্গে সতীশের প্রীতির বন্ধন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ছিঁড়িয়া গেল।

আজ কিন্তু সতীশ সুধীরকে দেখিয়া সত্যই অত্যন্ত আনন্দিত হইল। আমেরিকা হইতে সে কি শিখিয়া আসিয়াছে। কৃষিকর্ম্ম না করিয়া কি জন্যই বা সে ব্যাঙ্কের চাকরী গ্রহণ করিয়াছে তাহা জানিতে সে উৎসুক হইয়া উঠিল।

ট্রাম হইতে নামিয়া সুধীর কহিল—"এই যে সামনেই আমাদের আফিস।"

সিঁড়ি দিয়া দুই বন্ধু তেতলার একটি প্রশস্ত কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল। সতীশকে বসিতে বলিয়া সুধীর দরজার পর্দ্দাটা টানিয়া দিল,

তারপর একখানা চেয়ার অধিকার করিয়া বলিল—"গায়ত্রী বি-এ পাশ করেছে, শুনেছ বোধ হয়।"

সতীশ কহিল—"কাগজে দেখেছিলুম। এখন এম-এ পড়চেন ত?"

"সে কথা আর বলো না ভাই। তার মাথায় আজগুবি খেয়াল ঢুকেছে। পড়া শুনো আর কিছুই সে করতে চায় না। সে নাকি এখন দেশের কাজ করবে?"

"কি রকম?"

"তার কথার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝি না আমি। কখনো বলে সহরের বাইরে একটা বাড়ী ভাড়া করে অনাথ ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবে—কখনো বলে, দেশে গিয়ে পুর-মহিলাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। এই সব নিয়ে তার বৌদির সঙ্গে প্রায় রোজই তার ছোটখাট ঝগড়া হয়—আর রেগে কেঁদে আমাদের একেবারে অস্থির করে তোলে।"

"বউদিদি আবার কে হে সুধীর?"

সুধীর কহিল যে কিছুদিন হইল ব্যারিষ্টার-দুহিতা মিস্ দত্তের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে। এ বিবাহে তাহার পিতার তত মত ছিল না সত্য, কিন্তু তিনি নিষেধও করেন নাই। এ বিবাহে সে খুবই সুখী হইয়াছে।

সতীশ ঘড়ী দেখিয়া কহিল—"তোমায় আজ মোটেই কাজ করতে দিলুম না।"

"কাজ ত রোজই রয়েছে, সতীশ।" বলিয়া সুধীর বেহারাকে ডাকিয়া চা আনিতে কহিল।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল—"সুধীর, কৃষি শিখে এসে শেষটায় তুমি ব্যাঙ্কের চাকরী করচ কেন?"

"কৃষিকার্য্য কিছু অমনই হয় না, সতীশ। যে মূলধন হলে বেশ ভাল রকমের একটা ফার্ম্ম চালানো যায়, তোমার দেশ সে মূলধন দিতে পারবে না।"

সতীশ কহিল—"কথাটা ভাল করে বুঝতে পারচিনে সুধীর। কৃষিকর্ম্ম করতে খুব বেশী মূলধনের দরকার হয় কি?"

সুধীর হাসিয়া উত্তর করিল—"ঐ দাদার কালের বলদ আর লাঙ্গল দিয়ে আর কাজ চলে না। এর জন্ম নতুন নতুন যন্ত্রপাতি আমদানী করতে হবে যাতে করে জমি চাষ থেকে সুরু করে শস্য গোলায় পোরা পর্য্যন্ত, সকল কাজই সহজ ও সুন্দররূপে করা যায়। আমেরিকার এক একটা ফার্ম্ম, কি বিরাট ব্যাপার সতীশ! জমি চাষ, বীজ বপন সবই কলে হচ্ছে—শস্য কাটা, ছাঁটা কোন কাজই মানুষকে হাতে করতে হয় না!

"উর্ব্বরতা বাড়াবার জন্য বৈজ্ঞানিক উপাদানে তৈরী সার ব্যবহার করে জমিতে দেওয়া হয় বলেই আমাদের এই সুজলা সুফলা দেশের চেয়েও, সে দেশের মাটিতে অনেক বেশী ফসল উৎপন্ন হয়। আবার শ্রমিকদের জন্যই বা কি সুন্দর ব্যবস্থা! প্রত্যেক ফার্ম্মেই বড় বড় ব্যারাক রয়েছে। মেয়ে ও পুরুষ শ্রমিকরা ছেলে মেয়ে নিয়ে সেই সব ব্যারাকেই থাকতে পায়, তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা, চিকিৎসার বন্দোবস্ত সবই কেমন সুন্দর।

"প্রত্যেক ফার্ম্মারের মোটর রয়েছে, শহরের সঙ্গে টেলিফোন যোগ রয়েছে। প্রতিদিন দ্বিপ্রহর রাত্রে শহর থেকে তাদের কাছে বাজার দরের টাটকা খবর আসছে। তারপর গভর্ণমেণ্টের সাহায্যের সুবিধাত রয়েছেই!

"এই সব দেখে এসে কি আর তোমার দেশের তথা কথিত এই

কৃষিকর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে সতীশ? দেশের লোকে যদি টাকা দিতে পারত, তাহ'লে একবার দেখাতুম কৃষি কা'কে বলে।"

আমেরিকার কৃষি-পদ্ধতির এ বর্ণনা সতীশ কেতাবেই পড়িয়াছিল, কাজেই সুধীরের কথা শুনিয়া সে কিছুমাত্র বিস্মিত হইল না—বিস্মিত হইল সুধীরের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া। সতীশ মনে করিল সুধীরের আমেরিকায় যাওয়া একেবারে ব্যর্থ হইয়াছে। সে কেবল আমেরিকার অতুল ঐশ্বর্য্যই দেখিয়া আসিয়াছে, সে দেশের রুচি ও ভাবের ভক্ত হইয়াই ফিরিয়াছে।

পাশ্চাত্য কৃষি-বিজ্ঞানের যে তত্ত্ব সে শিখিয়া আসিয়াছে, কেমন করিয়া কুত অল্প আয়াসে, স্বল্পব্যয়ে তাহা কাজে লাগান যাইতে পারে, সুধীর সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র চিন্তা করে নাই। আমেরিকার মত সুযোগ ও সুবিধা থাকিলে ত অভাব কিছুই থাকিত না। এই কথাটুকু না বুঝিয়া সুধীর খুব জাঁকালো রকমের একটা ফার্ম্ম খুলিতে পারিবে না বলিয়া নিজের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা একেবারে বিসর্জ্জন দিল।

সতীশকে নীরব দেখিয়া সুধীর কহিল—"কি সতীশ, শুনে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলে দেখছি।"

"ঠিক তা নয়, সুধীর! আমারও কিছু বলবার আছে।"

"বেশত বলনা, শুনি!—তোমার কৃষির মোহটা আমি ঘুচিয়ে দিচ্ছি।"

সতীশ কহিল—"আমেরিকায় গিয়ে কৃষির যে চিত্র তুমি দেখে এসেচো, তা বেশ মনোরম সন্দেহ নেই। কলের সাহায্যে কাজের যথেষ্ট সুবিধা হয় সত্য, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে দেশটা যে কতগুলি বড় বড় কারখানায় পরিণত হবে, লোকগুলো যে ভোরে কলের বাঁশী শুনে

কাজে লেগে যাবে আর সারাদিন খেটে খেটে শরীর পাত করে বিশ্রামের ছুটি বাঁশীতে ঘোষিত হলে, তবে নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ পাবে, মানুষও যে এমনি করে কলেরই অংশ বিশেষ হয়ে দাঁড়াবে—এ কথা ভাবতেও আমি ব্যথা পাই! আর ব্যারাক জীবনটা যে খুবই সুখের তাও আমার মনে হয় না, সুধীর! আমাদের দেশের কৃষকগণ খুবই গরীব সত্য, তবুও তাদের মাথা গুঁজবার একটু ঠাঁই রয়েচে। ব্যারাক হ'তে বিতাড়িত হলে পাশ্চাত্য শ্রমিকদের কি-দুর্দ্দশাই না হয়! সারা বিশ্বে দাঁড়াবার মত স্থানটুকুও ত তাদের তখন থাকে না! সে দেশের ধন-কুবের ফার্ম্মারগণ এই শ্রমিকদের রক্ত শোষণ করেই ফুলে উঠেচে—বিনিময়ে তাদের যা দিয়েচে, তা অতি তুচ্ছ, একেবারে নগণ্য। ভগবান চিরদিন যেন আমাদের কৃষকদের এই রকম সব ফার্ম্মার ধন-কুবেরের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখেন!"

সুধীর এতক্ষণ মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল, এখন কহিল—"তোমার আইডিয়া একেবারে সেকেলে ধরণের দেখছি।"

সতীশ বলিল—"ইচ্ছে ত হয় সুধীর, যে, ভাবে ও কাজে একেবারে সেকেলে হয়ে যাই—কিন্তু পারি না যে!"

সুধীর কহিল—"তা যাই বল সতীশ, আমেরিকার কৃষি-পদ্ধতি এক তুড়িতে উড়িয়ে দেবার জিনিষ নয়। মার্কিন যে এ বিষয়ে কতদূর উন্নত, তা বোঝা যায় য়ুরোপের বাজারে সে দেশের কৃষিজাত দ্রব্যের আদর দেখে। বিদেশের মার্কেট অধিকার করতে না পারলে হাজার চেষ্টা করে তুমি দেশের এতটুকু উন্নতি করতে পারবে না।"

কতকগুলি কাগজ পত্র লইয়া আফিসের কেরাণীবাবু আসিয়া সেই ঘরে ঢুকিলেন। সুধীর কহিল—"আজ থাক না। ইনি আমার বন্ধু লোক—অনেক দিন পরে দেখা হলো।"

প্রাণ-প্রতিষ্ঠা

মাথা চুলকাইয়া কেরাণীবাবু বলিলেন—"বিশেষ জরুরি কাজ—আজকার ডাকেই পাঠাতে হবে।"

"দেখি,—তাড়াতাড়ি শেষ করে দিচ্ছি।" বলিয়া কাগজ পত্রগুলি উল্টাইয়া দেখিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিয়া সুধীর কহিল—"এ যে তিন ঘণ্টার আগে শেষ করা যাবে না, এতক্ষণ কি করছিলেন ?"

"আজ্ঞে, দুবার এসে ফিরে গেছি।"

সতীশ সুধীরকে বলিল—"তুমি ভাই তবে কাজ কর, আমি এখন উঠি।"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুধীর কহিল—"তাহ'লে কাল সকালে কিন্তু আমাদের বাড়ী একবার যেয়ো—আমি বাবাকে বলবো।"

বন্ধুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া সতীশ আপন মনে ভাবিতে ভাবিতে চলিল। তাহার মনে হইল, যে দেশের শতকরা নব্বুই জন লোক কৃষি কার্য্যে নিযুক্ত, সে দেশের ধনবানগণ যদি আমেরিকার আদর্শে বড় বড় ফার্ম্ম খুলিয়া বসেন, তাহা হইলে কৃষকদের লাঙ্গল গরু বিক্রয় করিয়া দিন মজুরী করা ছাড়া জীবিকার্জ্জনের অন্য কোন উপায় থাকিবে না। শ্রমিকদের সর্ব্বত্রই স্বল্প বেতনে গুরু পরিশ্রম করিতে হয় এবং নিজস্ব বলিতে সারা বিশ্বে তাহাদের এক রকম কিছুই থাকে না। এমন অবস্থায় পাশ্চাত্য কৃষির অনুকরণ করিতে গেলে এ দেশের কৃষকদিগকে অভাবের তপ্ত খোলা হইতে টানিয়া জলন্ত চুল্লীতে ফেলার সামিল হইবে বলিয়াই সতীশের বিশ্বাস।

পরদিন সকালে সতীশ যখন সুধীরদের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল, তখনো সুধীরের নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই—আনন্দমোহন বাবুও প্রাতঃভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। বসিবার ঘরের টেবিলের উপর সেই দিনকার একখানি খবরের কাগজ পড়িয়াছিল, সতীশ বসিয়া বসিয়া তাহাই পড়িতে

লাগিল। প্রায় দশ মিনিটের পর আনন্দমোহন ফিরিয়া আসিলেন এবং সতীশকে দেখিয়া বলিলেন—"কতক্ষণ এসেছ? সুধীর বুঝি এখন ওঠেনি?" তাহার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তারপর। এখন কি করবে স্থির করেছ?

"দেশে থেকেই কৃষি কর্ম্ম কর্‌ব, ভাবচি।"

"বটে! তোমার বাবা মত দিয়েছেন?"

"হাঁ, তিনিইত উদ্যোগ করে প্রায় একশ বিঘা জমি পত্তনি নিয়েছেন।"

"পুষায় গিয়ে কিছুদিন শিখে এলে ভাল হোত না?"

"তাই করব ভেবেছিলুম; কিন্তু বাবা বল্লেন তার কোন দরকার নেই।"

আনন্দমোহন কহিলেন—"সুধীরকে আমি বৃথাই আমেরিকায় পাঠিয়েছিলুম, এ সব কিছুই সে করতে চায় না।"

সতীশ কহিল—"কাল তার সঙ্গে আমার এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। সে খুব বড় স্কেলে আরম্ভ কর্‌তে চায়।"

"আসল কথা তা নয়, সতীশ। সে বড্ড আরাম প্রয়াসী হয়ে গেছে।" বলিয়া আনন্দমোহন দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর পুনরায় বলিলেন—"যাতে করে সুখ পায়, তা-ই সে করুক! তারপর, যন্ত্রাদি কিনবার কর্‌চ কি? তাতে ত অনেক টাকার প্রয়োজন হবে।"

সতীশ হাসিয়া উত্তর করিয়া—"প্রথমে আমি ওদিক দিয়ে যাবই না স্থির করেছি!"

আনন্দমোহন বিস্ময় প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তা হ'লে কি করে তুমি কাজ চালাবে?"

এমন সময় সুধীর আসিয়া সেই ঘরে ঢুকিল এবং একটু লজ্জিত হইয়া কহিল—"তুমি এত সকালে আসবে, তা মনে করিনি সতীশ।"

"সাড়ে আটটা যে বাজে সুধীর।"

ঘড়ীর দিকে চাহিয়া সুধীর কহিল—"তাইত বড্ড দেরী করে উঠেছি আজ!"

আনন্দমোহন হাসিয়া বলিলেন—"কবেই বা সকালে ওঠ?"

লজ্জিত হইয়া সুধীর কহিল—"আমেরিকার অভ্যাসটা এখনও ছাড়তে পারিনি বাবা।"

"হাঁ, তারপর যা জিজ্ঞাসা করছিলুম সতীশ, যন্ত্রাদি না কিনে কি করে তুমি চালাবে?

"আমাদের দেশের কৃষকেরা সুদখোর মহাজনদের উৎপীড়নে এমন জর্জ্জরিত হয়ে পড়েচে,—নিরন্তর অর্থশোষণে এত দরিদ্র হয়ে গেছে যে, জমিতে প্রচুর শস্য হলেও তারা দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় না। চক্রবৃদ্ধি হিসাবে সুদ হয়, আর মহাজনেরা সেই সুদের জন্য শস্য দাবী করে—কাজেই বেচারা কৃষকদের প্রায় সর্ব্বস্বই তাদের সঁপে দিয়ে নিজেরা স্ত্রী পুত্র নিয়ে অর্দ্ধাহারে বাস করে। এরা যে পরিমাণে খুব বেশী টাকা কর্জ্জ করে, তা নয়; কিন্তু তাও পরিশোধ করতে পারে না! মহাজনেরাও আসল টাকার জন্য কিছু তাগিদ করে না—কারণ, তারা জানে আসল টাকা আদায় হলে, তাদেরই ক্ষতি। আমার যে মূলধন লাগবে, তা হচ্ছে এই কৃষকদের ঋণমুক্ত করতে। আমি এই রকম জন কুড়ি লোক পেয়েছি। হাজার খানেক টাকা হলেই এদের সকলকে মহাজনের কবল থেকে উদ্ধার করতে পারব। তার পর এরা আমার জমিতে কাজ করবে—বিনিময়ে আমি তাদের ফসলের একটা ন্যায্য অংশ দেবো।"

সুধীর জিজ্ঞাসা করিল—"এই সব নিরক্ষর মূর্খদের নিয়ে তুমি কৃষি-কার্য্যের উন্নতি কর্‌বে মনে করেচ?"

সতীশ উত্তর করিল—"তারা নিরক্ষর সত্য, কিন্তু মূর্খ নয়, সুধীর। তাদের কাজ তারা বেশ ভালই বোঝে।"

সুধীর জিজ্ঞাসা করিল—"এই কুড়িজন লোকের খরচ জুগিয়ে, হাল, বলদ, বীজ ধানের দাম দিয়ে তোমার লাভের অংশটা কি পরিমাণে দাঁড়াবে, তা কি ভেবে দেখেচ?"

"কিছু না পেলেও স্কুল মাষ্টারের চেয়ে বেশী যে পাব, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

আনন্দমোহন কহিলেন—"ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি সতীশ, তোমার উদ্দেশ্য সফল হোক। আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে যতটুকু পারি তোমায় সাহায্য করব।"

যতদিন কলিকাতায় থাকিবে, প্রত্যহ একবার করিয়া আসিতে প্রতিশ্রুত হইয়া সতীশ সেদিনকার মত বিদায় লইল।

সতীশ চলিয়া গেলে সুধীর কহিল—"আমি কিন্তু বলে রাখলুম, বাবা, সতীশ কখনো লাভ করতে পারবে না।"

আনন্দমোহন সে কথার কোন জবাব না দিয়া খবরের কাগজে মনোনিবেশ করিলেন।

গায়ত্রী আসিয়া নানা কথার পর কহিল—"বাবা, সতীশ বাবুর প্ল্যানটা আমাদের বেশ লাগে। পর্দ্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে থেকে আমি শুনেচি।"

আনন্দমোহন কহিলেন—"সতীশ ত ঘরের ছেলে মা, তাকে দেখে আবার লুকিয়ে ছিলি কেন?"

"না থেকে কি করি! তুমি যে আমায় ডাকলে না! আমি পর্দ্দাটা

একটু সরিয়ে ইঙ্গিতে তোমায় জানালুম, তুমি আমার দিকে চাইলে, তবু কিছু বল্লে না।"

"আমি ভেবেছিলুম তোরই বুঝি আসবার মত নেই।"

"আচ্ছা বাবা, দাদা কেন বল্লে যে, সতীশবাবুর এতে করে কিছু লাভ হবে না? আমার ত মনে হয় বেশ হবে। আর টাকার দিক দিয়ে তেমন লাভ যদি নাই-ই হয়, তবুও কতগুলি কৃষকের দুর্গতি দূর করতে পারাও যে দেশের পক্ষে বড় ভাল।"

"তাত বুঝলুম, মা।—কিন্তু অন্ন চিন্তাও ত মানুষের করতে হবে!"

"সতীশবাবুর বাড়ীর অবস্থা শুনেচি বেশ ভাল?"

"হাঁ মন্দ নয়।" বলিয়া আনন্দমোহন পুনরায় সংবাদপত্র পড়িতে লাগিলেন।

গায়ত্রী পিতাকে আর বিরক্ত না করিয়া চলিয়া গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সতীশ যে কদিন কলিকাতায় ছিল, প্রায় প্রত্যহই আনন্দমোহনের সঙ্গে দেখা করিতে যাইত এবং নিজের কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করিত। গায়ত্রীও এই আলোচনায় যোগ দিয়া অসঙ্কোচে নিজের মত ব্যক্ত করিত। সুধীরের নিকট গায়ত্রীর দেশ-সেবার আকাঙ্ক্ষার কথা শুনিয়া সতীশ মনে করিয়াছিল উহা বোধ হয় শিক্ষিতা বালিকার একটী খেয়াল মাত্র ; কিন্তু পরিচয়ে সে বুঝিল যে, তাহার উদার হৃদয়ের সবটুকুই স্বদেশপ্রীতিতে পরিপূর্ণ। একদিন কথায় কথায় গায়ত্রী বলিল— "আপনাদের সমাজ মেয়েদের উপর বড়ই অত্যাচার করে সতীশবাবু।"

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল—"কি রকম ?"

"পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মত আপনারা তাদের আবদ্ধ করে রেখেছেন। আলো বাতাস হতে বঞ্চিত করে, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন রেখে আপনারা দেশের নারী-শক্তি একেবারে ব্যর্থ করে ফেলেছেন।"

"এ অভিযোগ আমাদের বিরুদ্ধে বহুদিন হতেই শোনা যাচ্ছে। কিন্তু যে দেশের পুরুষদের বেলা দশটা হতে সুরু করে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করে জীবিকার্জ্জন করতে হয় সে দেশের মেয়েরাই বা কেমন করে গৃহকার্য্য ফেলে রেখে আলো-বায়ুর সন্ধানে বার হবে ? জল আনা হতে আরম্ভ করে ধান ভানা পর্য্যন্ত সকল কাজইত তাঁহাদের করতে হয়। সহরে ত আপনারা সমাজের প্রকৃত চিত্র দেখতে পাবেন না। পল্লীগ্রামের মেয়েরা এত সব কাজ করেও সুযোগ ও সুবিধা পেলে আত্মীয় স্বজনদের বাড়ী স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করে থাকেন।"

"পল্লীগ্রামের কথা জানিনে সতীশবাবু কিন্তু সহরে যাঁরা থাকেন,

তাঁরা ত সবাই কিছু গরিব নন ; তারা কেন মেয়েদের ঘরের কোনে আটক রাখেন ?”

“কলকাতার কথা ছেড়ে দিন। এখানে একটা সমাজ গড়ে তোলা যায় না—প্রতিবেশীদের সঙ্গে জানাশুনা পর্য্যন্ত হয়ে উঠে না। মফঃস্বলের বড় সহরে যাঁরা বড় লোক, তাঁদেরও আত্মীয় স্বজন, জ্ঞাতি কুটুম্ব, উপার্জ্জনে অক্ষম এত লোক প্রতিপালিত করিতে হয় যে তাঁদের সংসারগুলি সব বিরাট ব্যাপার। তাঁদের মেয়েদের শারীরিক পরিশ্রম করিতে না হলেও এত কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় যে, সারাদিন এতটুকুও সময় করে নিতে পারেন না।

“তাইত বলছিলুম, সতীশ বাবু। আপনারা অনাবশ্যক এত সব কাজ মেয়েদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন যে, তার চাপে তাদের ভিতরের মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমাদের সমাজেও গরীব গৃহস্থ রয়েচেন—তাঁদের মেয়েদেরও নিজহস্তে সংসারের সব কাজ করিতে হয় ; কিন্তু তবু তারই মাঝে সময় করে নিয়ে তাঁরা আমোদ-উৎসবে যোগদান করে থাকেন।”

সতীশ হাসিয়া বলিল - “আমোদ উৎসব কি আমাদের মেয়েরাই করেন না ? আমাদের সমাজের গৃহস্থদের পূজা পার্ব্বণের অন্ত নেই। আর মেয়েরা যে তাতে আমোদ পান না, চোখের জল চেপে রেখে কাজ করেন তাতো নয় !”

গায়ত্রী এ কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না। সতীশ আবার কহিল—“আমি বলতে চাইনে যে, আমাদের সমাজের কোথাও এতটুকু গলদ নেই—একেবারে আদর্শ সমাজ। আমি বলি, হিন্দু বলেই যে, আমাদের দোষ রয়েচে, তা নয়—দোষ বেড়ে উঠেচে আমরা পরাধীন জাতি বলে। নইলে হিন্দুত্ব ঘুচিয়ে এই দেশে যাঁরা ভিন্ন ভিন্ন সমাজ

গড়ে তুলেছেন, তাদের প্রতিষ্ঠিত সেই সব নবীন সমাজ-শরীরেও কীট প্রবেশ করবে কেন ?"

তখন রৌদ্র পড়িয়া গিয়াছে। তেলের কলের চিমনি হইতে কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া বাহির হইয়া আকাশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। চৈত্রের বাতাস ধূলা উড়াইয়া পথপার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষরাজির নবোদ্গত পত্রাবলীর শ্যামশোভা ম্লান করিয়া ফেলিয়াছে। সতীশ জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল এবং চারিদিকে চাহিয়া বলিল—"এমন সময় যদি একবার আপনারা পল্লীমায়ের মূর্ত্তিখানি দেখতেন, তাহলে আর কলকাতায় থাকতে চাইতেন না।"

আনন্দমোহন কহিলেন—"গায়ত্রী ত দেশে যাবার জন্য আমায় একেবারে অস্থির করে তুলেছে।"

"বেশত ! একবার চলুন না, আপনারা। সামান্য একটু মেরামত করলেই আপনাদের বাড়ীটা বাসোপযোগী হয়ে উঠবে।"

"হাঁ, দেশে গিয়ে এখন ম্যালেরিয়ায় মরে যাই আর কি !" বলিয়া আনন্দমোহন গায়ত্রীর মুখপানে চাহিলেন।

গায়ত্রী কহিল—"বাবার সঙ্গে এই যায়গায়ই আমার মতের অমিল, সতীশ বাবু। আপনারা ত বারমাস পল্লীগ্রামে থাকেন, কিন্তু খুব কি ম্যালেরিয়ায় ভোগেন ?"

সতীশ উত্তর করিল—"ভুগলেই বা কি করি বলুন ? সবাই যদি গাঁ ছেড়ে চলে আসি, তাহলে পল্লীর প্রাণকে যে গলা টিপে মারা হবে।"

উৎসাহ পাইয়া গায়ত্রী কহিল—"আমিও বাবাকে ঐ কথা বলি—কিন্তু তিনি কিছুতেই বোঝেন না !"

আনন্দমোহন বুঝিতেন সবই ! পল্লীকে তিনি ভাল করিয়াই জানেন। পল্লীর জল বায়ুর দ্বারাই তাঁহার শরীর গঠিত ও পুষ্ট

হইয়াছে—তাঁহার মধুর শৈশব ও কৈশোরের তরুণ সরল জীবন তিনি পল্লীমায়ের ক্রোড়েই অতিবাহিত করিয়াছেন। জীবনের নব বসন্তে যৌবনের প্রারম্ভে নূতন ভাবের বন্যায় গা ভাসাইয়া দিয়া তিনি দূরে সরিয়া পড়িয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পল্লীকে তিনি ভুলিতে পারেন নাই। এই প্রৌঢ় বয়সে সহরের কোলাহলে উত্যক্ত হইয়া তিনি পল্লীজননীর শ্যামস্নিগ্ধ ক্রোড়ে আবার ফিরিয়া যাইতে সঙ্কল্প করিয়াছেন—অন্তরায় দাঁড়াইয়াছে পুত্র কন্যারা। তাহারা আনন্দমোহনের সঙ্কল্পে বাধা দিয়াছে, তাহা নয়; পল্লীতে যাইতে বরং আগ্রহই প্রকাশ করিয়াছে। আনন্দমোহন পল্লীকে জানেন, পল্লীর দশ জনকে বুঝেন বলিয়াই পুত্র কন্যাদের লইয়া দেশে যাইতে তিনি সাহস পান নাই। পাছে দেশের লোকের তাচ্ছিল্য তাহাদের অন্তরে পল্লীর প্রতি অশ্রদ্ধা জাগাইয়া তুলে, ভিন্ন সমাজের ভিন্ন ধর্ম্মের লোকের প্রতি পল্লীবাসীর যে একটা উদ্ভট ধারণা রহিয়াছে, তাহার জন্য পাছে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা উপস্থিত হয়, এই সব আশঙ্কা করিয়াই তিনি এতদিন ম্যালেরিয়া কলেরার কথা বলিয়া কন্যাকে নিবৃত্তি রাখিয়াছিলেন। আজ যখন গায়ত্রী বলিল যে তিনি কিছুই বুঝেন না, তখন আনন্দমোহন সত্যই খুব আমোদ অনুভব করিলেন।

পিতাকে নীরব দেখিয়া গায়ত্রী মনে করিল যে, সতীশের সম্মুখে আর একবার অনুরোধ করিলে তিনি সম্মতি না দিয়া থাকিতে পারিবেন না। সে কহিল—"বাবা! কিছুদিন গিয়ে দেশে থাকলে কেমন হয়?"

আনন্দমোহন উত্তর করিলেন—"সতীশ বলছে যে, সে পল্লীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করবে। তার কাজ শেষ হোক্—তখন আমরা গিয়ে মাতৃপূজায় যোগ দেব।"

সতীশ কহিল—"কিন্তু আপনাদের সাহায্য না পেলেও যে আমার সাধনা সিদ্ধ হবে না।"

কিয়ৎকাল নীরবে থাকিয়া আনন্দমোহন কহিলেন—"যদি সত্যই তাই মনে কর সতীশ, যে আমাদের নিয়ে তোমার কাজ হবে, তাহলে আমাদের জানিয়ো। বাপে মেয়েতে মিলে আমরা গিয়ে দেশ-সেবায় ব্রতী হব।" বলিয়া আনন্দমোহন গায়ত্রীর মত জানিতে চাহিলেন।

গায়ত্রী কহিল—"হাঁ বাবা, সেই বেশ হবে। সতীশ বাবু আপনি কিন্তু গিয়েই বাবাকে চিঠি লিখবেন।"

আনন্দমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি আজই যাবে-সতীশ?"

"হাঁ, অনেকদিন এসেছি।"

গায়ত্রী কহিল—"বাবা, সতীশ বাবুকে ত একদিন খেতেও বল্লুম না।"

"ওকি আর আমাদের ঘরে খাবে রে পাগলি?"

"ওঃ তাইত। আমার মনেই থাকে না বাবা, যে সতীশবাবু ভিন্ন সমাজের লোক।" বলিয়া গায়ত্রী নতমুখে একখানা বইয়ের পাতা উল্টাইতে লাগিল। সন্ধ্যার পর সতীশ তাহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বাসায় ফিরিল। এই কয়েকদিনের যাতায়াতে এবং ভাবের আদান প্রদান বশতঃ তাদের মাঝে আবার এমনই একটা ঘনিষ্ঠভাব জমিয়া উঠিয়াছিল যে, বিদায়কালে সকলেই একটা বেদনা অনুভব করিলেন।

পড়ার ঘরে একাকিনী বসিয়া গায়ত্রী ভাবিতেছিল, কি মহৎ উদার প্রাণ লইয়া সতীশ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে! আনন্দমোহনের কাছে প্রত্যহ কয়টী শিক্ষিত যুবক সমবেত হইয়া অনেক আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা করিয়া থাকে। তাহারা সংবাদপত্রে দেশের

অবস্থা সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখে, সভাসমিতির বক্তৃতায় বেশ বাহবাও পায়, কিন্তু সতীশের মত এমন করিয়া কেহ ত দেশকে ভালবাসে না! সুধীরের কাছে সতীশের উদ্দেশ্য ও তাহার কার্য্য-প্রণালীর পরিচয় পাইয়া একদিন ইহাদের চেয়ার টেবিলে হাসির তরঙ্গ উঠিয়াছিল, পরিহাস করিয়া কতজন কত কথাই কহিয়াছিল। পূর্ব্বে ইহাদের যুক্তি তর্ক শুনিয়া গায়ত্রী মনে করিত এই একটা দল গড়িয়া উঠিতেছে, যাহাদের দ্বারা এই দুর্ভাগা দেশের অনেক কাজই সাধিত হইবে। কিন্তু সতীশের কথাবার্ত্তা শুনিয়া দেশ-সেবার প্রকৃত অর্থ বুঝিয়া তাহার মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, ইহারা যাহা করিতে চায়, তাহা আর যাহাই হৌক না কেন দেশের কাজ নিশ্চিতই নয়।

আজও এই দলের দু'তিনজন যুবক তাহাদের বাড়ীতে আসিয়াছে। আনন্দমোহন উপাসনায় বসিয়াছিলেন বলিয়া তাহারা সুধীরের সঙ্গেই গল্প করিতেছিল। গায়ত্রী মনে করিল আজ যদি তাহার পিতার উপাসনা শেষ হইতে খুব বিলম্ব হয়, তাহা হইলে সে বাঁচে। আনন্দ মোহন আসিলে তাহাকেও ইহাদের সম্মুখে যাইতে হইবে। ইহাদের বাজে কথা শুনিতে আর তাহার ইচ্ছা হয় না। অনাবশ্যক ভূমিকা গ্রহণ করিয়া কেন যে তাহাকে মাঝে মাঝে ইহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হয়, তাহা গায়ত্রী বুঝিতে পারে না—সে শুধু এইটুকুই বুঝে যে, ইহাই তাহার পিতার ইচ্ছা!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দেশে ফিরিয়া সতীশ দেখিল যে, মহিম মুখুজ্যে ও হলধর খুড়ো মহা অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। যে সমস্ত কৃষকদের টাকা দিয়া সতীশ সাহায্য করিয়াছিল, তাহারা কর্জ্জের টাকা পরিশোধ করিতে গেলে হলধর খুড়ো বলেন যে, আসল টাকা তিনি কিছুতেই গ্রহণ করিবেন না। প্রজারা কান্নাকাটি করায় মহিম মুখুজ্যের পরামর্শে হলধর খুড়ো একজনকে বিষম প্রহার করিয়াছেন এবং বেশী বাড়াবাড়ি করিলে তাহাদের বাড়ীঘর উচ্ছন্ন করিয়া তাহাদের ভিটায় সর্ষের ক্ষেত তৈরী করিবেন এইরূপ শাসাইয়া দিয়াছেন। সতীশ বাড়ী আসিতেই দল বাঁধিয়া তাহারা আসিয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিল।

সতীশ মহা বিপদে পড়িল। মহিম মুখুজ্যে ও হলধর খুড়ো তাহার কোন অনুরোধ যে রক্ষা করিবেন না, তাহা সতীশ ভালরূপই জানিত। সে পিতাকে সমস্ত জানাইল। তারানাথ কৃষকদিগকে লইয়া হলধর খুড়োর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে সুদ সমেত সমস্ত টাকা বুঝিয়া লইতে বলিলেন। হলধর খুড়ো কহিলেন—"দেখুন রায় মশাই, এই সব ছোট লোকদের সাহস বাড়িয়ে তুলবেন না। বড্ড নেমকহারাম ওরা! যখন খেতে পেত না, তখন ওদের দুর্দ্দশা দেখেইত মশাই সিন্দুক হতে কাঁচা টাকা গুলো গণে বার করে দিয়েছিলাম। নিয়মমত সুদ দেয়নি, তবুও কিছু বলিনি। ভেবেছি বেচারা গরীব ওরা, যখন যেমন পারে তেমন দেবে। আর আজ দেখুন আমার সঙ্গে কি ব্যবহার করচে।"

তারানাথ বলিলেন—"এমন অন্যায় কিছুত করেনি এরা? টাকা

সংগ্রহ করতে পেরেচে, তাই স্থদে আসলে সবই পরিশোধ করতে এসেচে। আপনি সেগুলি বুঝে নিয়ে এদের রেহাই দিন—সব গোল চুকে যাবে।"

"ব্যাটাদের পেটে পেটে ঢের বজ্জাতি রয়েচে মশাই। কেন, ওরা যদি আমার হাত পা ধরে পড়ত, আমি কি ওদের ফেরাতে পারতুম? তা না করে আপনাকে নিয়ে এসেচে সাক্ষী করতে। আমি সব শালাকে জুতিয়ে হাড় ভেঙে দেব!"

মধু কৈবর্ত্ত আর সহ্য করিতে পারিল না। সে কহিল—"আপনারা কর্ত্তা ভদ্রলোক, অমন মুখ খারাপ করবেন না। স্থদ দিতে একদিন দেরী হয়েচে—আর আপনি লোক দিয়ে গোলা ছুটিয়ে ধান নিয়ে এসেছেন। আমরা যে কি খেয়ে বাঁচব তাও একবার ভেবে দেখেন নি। আমরা টাকা ধারি তাই মুখ ফুটে কিছু কইতে পারি না। গোপাল আপনার ঠেঙে গত সন দেড় কুড়ি টাকা নিয়েছিল—আর আপনি স্থদ বাবদ তিন কুড়ি টাকা দাবী করে, তারও তিনগুণ দামের ধান কেড়ে নিয়েছেন। এমন সর্ব্বনেশে দয়া আপনার!"

ক্রোধকম্পিতস্বরে হলধর খুড়ো কহিলেন—"চুপ কর হারামজাদা!··· আমায় চটাস্‌নি বলচি!"

তারানাথ মধুকে বাহিরে যাইতে বলিয়া হলধর খুড়োকে স্থির হইতে বলিলেন।

"শুনলেন ত মশাই, ছোট লোকদের কথা! থাকত আজ মহিম বাড়ী —মজাটা আমি দেখিয়ে দিতুম।" হলধর খুড়ো গম্ভীরভাবে তাম্রকূট সেবন করিতে লাগিল।

তারানাথ পুনরায় কহিলেন—"তা এই ছোটলোকদের ঝঞ্চাটটা মিটিয়ে ফেল্লেই ত পারতেন।"

"আপনারই বা অত মাথাব্যথা কেন, মশাই ? আমার টাকা যখন ইচ্ছে আমি ফিরে নেব।"

"বেশ তবে তাই নেবেন।" বলিয়া তারানাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হলধর খুড়ো কহিলেন—"দেখুন রায় মশাই ! আমাদের একেবারে ছেলেমানুষ মনে করবেন না। আমরা বুঝি সবই। আপনারা পিতা-পুত্রেই ত এই সব ছোটলোকদের বুকের পাটা বাড়িয়ে তুলেচেন। নইলে যারা খেতে পেত না, এমন সময় তারা এত টাকা কোথায় পেলে। আমিও আপনাদের একথা বলে রাখচি যে, হলধর চক্রবর্ত্তী, বেঁচে থাকতে কারু কাছে মাথা নোয়াবে না।"

তারানাথ কিছু না বলিয়া কৃষকদের লইয়া গৃহে ফিরিলেন। সতীশ উৎকণ্ঠিত চিত্তে বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল। তারানাথ তাহাকে কহিলেন —"না রে সতু, কিছু করে আসতে পারলুম না।"

"তা হলে কি হবে, বাবা ?"

"কোন ভয় নেই, সতু। ফসল কাটিয়ে সব আমার বাড়ী এনে রাখব। সুদের তাগাদায় গেলে একটি পয়সাও তোমরা কেউ দিয়োনা। আমি আজই আমার উকিলকে সব ঘটনা জানিয়ে চিঠি লিখে দিচ্ছি— আর সব টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি তার কাছে।"

"এই নিয়ে শেষটায় মোকদ্দমা করতে হবে, বাবা ?"

"কি করব, অন্য কোন উপায় যে নেই সতু।"

কৃষকদিগকে অভয় দিয়া সতীশ তাহাদিগকে বিদায় দিল। পথে যাইতে যাইতে মধু তাহার সঙ্গীদের বলিল—"দাদাঠাকুরের মত দেবতা রয়েছে বলেই ভদ্দরলোকের ইজ্জত রয়েছে।"

করিম কহিল—"দাদাঠাকুরের জন্য জান কবুল করেও সুখ আছে মধু।"

বিপিন একটু বেশী বুদ্ধি রাখিত বলিয়া দলের মধ্যে তাহার বেশ সুখ্যাতি ছিল। তাহাকে নীরব দেখিয়া করিম কহিল—"তুই যে চুপ করে রয়েছিস, বিপিন।" বিপিন কহিল—"কার পেটে কি আছে তা' কেমন করে বলব ভাই। চক্কোত্তি যখন টাকা ধার দিয়েছিল, তখন কেমন মিষ্টি মিষ্টি কথাই কইত! এখনই না কেউটে সাপ হয়ে বসেছে। কথাটি কইলেই ফোঁস করে ওঠে।"

মধু রাগিয়া কহিল—"তোর নরকেও ঠাঁই হবে না বিপিন। দাদা-ঠাকুরকে তুই অবিশ্বাস করিস!"

বিপিন উত্তর করিল—"না রে মধু, অবিশ্বাস করিনে—তাঁর পায়ের ধূলো জন্ম ভরে মাথায় রাখব আমি। তবে জানিস্ কি ভাই, চূণ খেয়ে একবার মুখ পুড়েছে বলেই আজ দই দেখেও ভয় পাই!"

মধু তাহার সহিত আর ভালো করিয়া কথা কহিল না। তাহার মনে বিষম একটা খট্‌কা লাগিয়াছে। বিপিন যদি দাদাঠাকুরকে বিশ্বাসই করিবে, তাহা হইলে অমন কথা বলিবে কেন? সে দিন ক্ষেতের কাজ সারিয়া আসিয়া তামাক খাইতে খাইতে তাহার মনে হইল দাদাঠাকুরকে জানাইয়া রাখা দরকার যে বিপিনটা বিগড়াইয়াছে। নইলে চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে যোগ দিয়া যদি কোন অনর্থ ঘটায়! কল্কেটা মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া সে তৈলপক্ক বংশ-লগুড়খানি হাতে লইয়া বাহির হইল। মধুর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল—"এখন আবার কোথায় যাও?"

"দাদাঠাকুরের বাড়ীটা একবার ঘুরে আসি। তুই সাবধানে থাকিস।"

সতীশ তখন চাঁপাকে পড়া বলিয়া দিতেছিল। বাহির হইতে মধু ডাকিল—"দাদাঠাকুর।"

"কেরে মধু? বাইরে দাঁড়িয়ে কেন?···ঘরে এসে বোস্।" মধু মেজের উপর গিয়া বসিল।

"ঐ মাদুরটা পেতে বোস্ না রে।" বলিয়া সতীশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

"তুমি বোস দাদাঠাকুর—আমি একটা কথা বলেই চলে যাচ্ছি।" বলিয়া মধু চাপা কণ্ঠে বিপিনের কথা কহিল।

সতীশ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এই কথা বল্‌তে রাত করে এসেছিস তুই।"

মধু উত্তর করিল—"না এসে করি কি দাদাঠাকুর!—আমার যে রেতে ঘুম হত না।"

সতীশ তাহাকে বুঝাইয়া কহিল যে বিপিনের কোন দোষ নাই। এতদিন তাহারা যে অত্যাচার সহিয়া আসিয়াছে—যত রকমে প্রতারিত হইয়াছে, তাহাতে সহসা কাহারও উপর বিশ্বাস স্থাপন না করাটাই তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। আর বিপিন যদি তাহার প্রস্তাব মত কার্য্য করিতে স্বীকৃত নাই হয়, তাহা হইলেও ক্ষতির কোন আশঙ্কা নাই।

"তুমি দাদাঠাকুর বড় শাদা মানুষ; তাই ওকথা কইছ। বিপিন যদি চক্কোত্তির সঙ্গে যোগ দেয়, তা হ'লে বিষম ল্যাঠা হবে কিন্তু।" বলিয়া মধু উঠিয়া দাঁড়াইল।

"না রে বৃথা তুই চিন্তা করিসনে।" বলিয়া সতীশ মধুকে বিদায় দিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সারাদিন পরিশ্রম করিয়া মধু সবেমাত্র গৃহে ফিরিয়া তামাক খাইবার আয়োজন করিতেছিল। এমন সময় হলধর খুড়ো তাহার কুটীরের সামনে উপস্থিত হইলেন। মধু তাহাকে প্রণাম করিয়া বসিতে একখানা আসন দিল এবং কল্কেটি কাছে রাখিয়া কলার পাতা ছিঁড়িয়া আনিয়া তাহার হাতে দিল।

হলধর খুঁড়ো বলিলেন—"হ্যাঁরে মধু, এত তোদের আস্পর্দ্ধা!"

করজোড়ে মধু কহিল—"এজ্ঞে কর্ত্তা, অপরাধ কিছুইতো করিনি।"

"করিসনি কি রে হতভাগা! জলে থেকে কুমীরের সঙ্গে বাদ? যা তো এখুনি একবার পাড়ার সবাইকে ডেকে নিয়ে আয় তো! আমার বিশেষ কাজ আছে।"

মধু সঙ্গীদের ডাকিতে গেল।

হলধর বলিলেন—"হ্যারে যেদো! এবার তোরা দুটো লাউ খেতেও দিলিনে—গাছে ত ফলেচে খুবই।" যাদব মধুর দশবৎসর বয়স্ক পুত্র। মায়ের শিক্ষামত সে বলিল—"আজ্ঞে কাল আপনার বাড়ী গিয়ে দিয়ে আসব।"

"কাল কেনরে হতভাগা!...এতদিন কর্‌ছিলি কি? সতীশের বাড়ীতে ক'টা পাঠান হয়েচে?"

"আজ্ঞে, দা'ঠাকুরত কিছুই নিতে চান না।"

"চুপ কর যেদো, চুপ কর বল্‌চি। দা'ঠাকুর দা'ঠাকুর বলে আমায় বিরক্ত করিসনি।"

"আজ্ঞে কর্ত্তা; ঐ কম্মেই যে তাঁকে ডাকি।"

"চুপ কর, হাড় গুঁড়িয়ে দেব।"

মায়ের ইঙ্গিতে যাদব চুপ করিল। সে ভাবিল, দা'ঠাকুর ত কখনো এমন রেগে কথা বলেন না। কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া হলধর কহিলেন —"ভদ্রলোক বাড়ী এলে দুটো পান দিতে হয়, তাও বুঝি জানিসনে তোরা ?"

যাদব ঘরের মাঝে গিয়া কহিল—"আজ্ঞে পান ত নেই কর্ত্তা।"

"বুঝেচি তোদের বজ্জাতি! আচ্ছা দে এখনই গাছে যে কয়টা লাউ আছে, সব তুলে দে—আর লতাপাতাও কিছু দিস্ কিন্তু। কাল আমার পুত্রের অন্নপ্রাশন।"

যাদবকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া হলধর নিজে উঠিলেন এবং একখানি কাটারি লইয়া সব কটি লাউ আর গাছের লতাপাতা কাটিয়া আনিয়া স্তূপীকৃত করিলেন। মধুর পত্নীর দুই চক্ষু ছাপাইয়া জল ঝরিয়া পড়িল—যাদব কাঁদিয়া কহিল—

"কর্ল্লে কি কর্ত্তা, গাছটা যে মরে যাবে।"

হলধর সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন—"দে,তামাক দে।"

সঙ্গীদের লইয়া ফিরিয়া আসিয়া মধু লাউ গাছের দুরবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এ কিরে যেদো!—এ কি করেছেন কর্ত্তা ?"

হলধর খুড়ো সমবেত কৃষকদিগকে বসিতে বলিলেন। মধু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"এমন সর্ব্বনাশ কেন করলেন, কর্ত্তা ?"

সে প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া কৃষকদিগকে সম্বোধন করিয়া হলধর বলিলেন—"তোরা সব একজোটে বিদ্রোহ করেচিস না ? বেশ করে-চিস্, কিন্তু এ কথাটি মনে রাখিস্ যে, হলধর চক্রবর্ত্তী বিদ্রোহ দমন করতে জানে।"

করিম সেখ কহিল—"আমাদের অদৃষ্টে চিরদিন দুঃখ রয়েছে তাত জানিই কর্ত্তা—এখন আমাদের স্মরণ করেছেন কেন, তাই বলুন।"

খুড়ো বলিলেন—"আমি আজই তোদের সবার সুদের টাকা সমস্ত বুঝে নিতে চাই।"

বিপিন কহিল—"টাকা নিয়ে তো বসেই রয়েছি কর্ত্তা, আসলটা নিতে চাইলেই আমরা সব শোধ করে দিতে পারি।"

কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য কোমল করিয়া হলধর বলিলেন—"আসল টাকা আমি এখন চাইনে। তোদের টাকা দিয়েছি—জলে ত ফেলিনি! এত তাড়া কিসের? এখন তোদের কষ্ট হয়, ধীরে সুস্থে পরিশোধ করিস! আমার কি আর দয়ামায়া নেই—মানুষেরইত শরীর আমার! কিন্তু আমাকেও ত খেয়ে বাঁচতে হবে—নইলে কি অমনিই আর তাগিদ করি? তোদের অবস্থা ত আমার জানা আছে। টাকাটা কড়িটা না হলে আমারও যে চলে না! এইত কাল পৌত্রটির অন্নপ্রাশন—হাতে একটিও পয়সা নেই। তোদের কাছে সুদ চাইতে এসেছি। নিতান্ত ঠেকা কাজ বলে মধুর গাছের এই ক'টা লাউ তুলে নিয়েছি—মধু কিন্তু তাতেই অসন্তুষ্ট হয়েছে?" কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন—"টাকা যদি আজ নেহাৎই তোরা না দিতে পারিস্, তা হলে তোদের বাড়ীতে তরিতরকারি যা কিছু আছে, দিয়ে, আমার কালকার কাজটা উদ্ধার করে দে।"

কৃষকগণ নীরবে বসিয়া রহিল। হলধর খুড়ো কহিলেন—"এতদূরই যখন এসেছি, তখন চল্ একবার তোদের বাড়ীগুলোও ঘুরে যাই। মধু, তুই এই লাউ কটা আর লতাপাতাগুলো নিয়ে আমার সঙ্গে চল।"

বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া হলধর খুড়ো যাহা পাইলেন, জোর করিয়া ছিঁড়িয়া তুলিয়া লইলেন। দরিদ্র কৃষকগণ নুন-ভাত খাইয়া দিন কাটাইতেছে,

তবুও গাছের ফল পাতা তুলিয়া একদিনও তাহারা ভাল করিয়া আহার করে নাই। হাটে উহা বেচিয়া নুন-তেল কিনিবে। হলধর খুড়ো যখন স্বহস্তে গাছের ফলগুলি ছিঁড়িয়া লইল, তখনও এই অসহায় কৃষকেরা মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিল না। মধু, বিপিন ও করিমের স্কন্ধে সংগৃহীত তরকারির বোঝা চাপাইয়া দিয়া হলধর তাহাদের সঙ্গে লইয়া গৃহে ফিরিলেন। তাহার বাড়ীতে পৌঁছিয়া মধু প্রভৃতি যখন মাথার বোঝা নামাইয়া দাঁড়াইল, তখন মহিম কহিলেন—"এখন বাড়ী ফিরে যা। কিন্তু কাল বিকেলে যদি সুদের টাকা না দিয়ে যাস, তা'হলে ভাল হবে না।"

গৃহে ফিরিবার সময় সতীশের বাটীর কাছে উপস্থিত হইতেই মধু সঙ্গীদের কহিল—"চলরে, দা'ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করে যাই।" তাহারা গিয়া সতীশকে ডাকিল।

সতীশ বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এমন অসময়ে কেনরে করিম?" তাহারা মহিম খুড়োর কাণ্ড জানাইয়া বলিল যে এর পর তাহাদিগকে বিনা লবণে ভাত খাইতে হইবে।

উত্তেজিত হইয়া সতীশ জিজ্ঞাসা করিল—"তোরা দিলি কেন?" করিম উত্তর করিল—"আজ্ঞে ভদ্দর লোক চাইলেন—না দিয়ে কি করি?"

"কে ভদ্রলোক, করিম? যে তোদের গোলা ভরা ধান লুণ্ঠন করে তোদের অনাহারে মারবার উপক্রম করেছে, তোদের বুকের মাঝে অশান্তির অনল জ্বেলে দিয়েছে, সুদের নামে বিন্দু বিন্দু করে তোদের হৃদয়-শোণিত শুষে খাচ্ছে—তাকে যদি ভদ্রলোক বলিস, তাহলে ভদ্রলোকের অপমান করা হয়।"

মধু কহিল—"দা'ঠাকুর! চক্রবর্ত্তী মশাই যে ব্রাহ্মণ।"

প্রাণ-প্রতিষ্ঠা

"কে বল্লে ব্রাহ্মণ? ব্রাহ্মণ এ দেশে আর নেই। কাকে তোরা পূজা করে দেবতার অপমান করচিস?" বলিতে বলিতে সতীশের চক্ষু জলে ভরিয়া গেল।

তাহাদের ব্যথার কথা শুনিয়া দাদাঠাকুর কাঁদিয়া ফেলিয়াছেন—তাহাদের উপর অনুষ্ঠিত অত্যাচার দাদাঠাকুরের প্রাণে শেলের আঘাত করিয়াছে বুঝিয়া মধু তাহার পদধূলি লইয়া বলিল—"তুমিই ত সত্যিকার বামুন, দাদাঠাকুর।"

"না মধু, না করিম—ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করেচি সত্য, কিন্তু ব্রাহ্মণ এখনও হতে পারিনি।" বলিয়া সতীশ বারান্দায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সতীশের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া তারানাথ বাইরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হয়েচে রে সতু।"

সতীশ কহিল—"এত বড় অত্যাচার, এমন উৎপীড়ন আর কত কাল এরা সহ্য করবে, বাবা?"

সমস্ত শুনিয়া তারানাথ কহিলেন—"তোমরা কেন বল্লেনা যে, এই তরকারী বেচে তোমাদের লবণ কিনতে হবে?"

"আজ্ঞে আমরা বলেছিলাম, কর্ত্তা—তিনি জবাবই দিলেন না।"

"যাক্—যা হবার তা' হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে চক্রবর্ত্তী যেন এক গাছা তৃণও জোর করে নিতে না পারে।"

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা তোদের যে সব কেড়ে নিলে, কাল অন্নপ্রাশন বলে তোদের খেতে নেমন্তন্ন করেচে?"

মধু কহিল—"দুঃখের কথা বলব কি দাদাঠাকুর! বোঝা বয়ে এতটা পথ এলাম, তা বসতেও বল্লেন না। আরও শাসিয়ে দিলেন যে, কাল বিকেলে সুদের টাকা না দিয়ে এলে আমাদের ভাল হবে না।"

তারানাথ কহিল—"আচ্ছা তোমরা সব এখন বাড়ী ফিরে যাও। স্থদের টাকা চাইলে বলো যে, নালিশ করে যেন আদায় করে নেয়।"

উভয়ের পদধূলি লইয়া তাহারা চলিয়া গেল।

সতীশ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল—এ কতবড় অনিয়ম—কি বিষম অবিচার যে, একজন পৌত্রের অন্নপ্রাশনে অনাবশ্যক ব্যয় করিবে বলিয়া, এই দরিদ্র কৃষককুল তাহাদের আবশ্যকীয় জিনিষ পর্য্যন্ত ক্রয় করিতে পারিবে না—এমন কি লবণটুকুও না! হায় বাংলার ভাগ্যহীন কৃষকের দল! আজন্ম অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া বেদনাটুকুও অনুভব করিবার শক্তিও তাহাদের লোপ পাইয়াছে। বাল্যকাল হইতেই তাহারা দেখিয়া আসিতেছে যে, তাহাদের সর্ব্বস্বই ব্যয়িত হইতেছে তথাকথিত ভদ্রলোকের স্থখ ও স্থবিধার জন্য। সমস্ত বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া, গায়ের রক্ত জল করিয়া দেশকে তাহারা শস্যশালিনী করিবে আর কয়টী মুষ্টিমেয় লোক তাহাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে পায়ে দলিয়া চলিয়া যাইবে।

শোবার সময় মনোরমা স্বামীর কাছে কৃষকদের দুর্গতির কথা শুনিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল—"সেকি! শুধু নুন আর ভাত খেয়ে থাকে?"

"তাই কি সব সময়ে জোটে, মনু!"

"তাদের জমিতে বুঝি ধান হয় না?"

"হয়। কিন্তু তাই বেচে তারা মহাজনের স্থদ যোগায়। অল্প যা কিছু থাকে তাও বেচে মাঝে মাঝে আবার জাপানের আমদানী চুলের ফিতা, লেডিগেঞ্জি, জলেভাসা সাবান, এই সব কিনে টাকা উড়িয়ে দেয়।"

"পোড়া সখও ত আছে!" বলিয়া মনোরমা হাসিল।

সতীশ কহিল—"হেস না, মনু—হাসবার কথা কিছু নয়। তারাও ত মানুষ। ছেলেমেয়েদের একখানা ভাল কাপড় পরতে দিয়ে, দুটো খেলনা দিয়ে তাদের মুখে হাসি দেখতে ইচ্ছে হওয়াটা কৃষকদের পক্ষে খুব অস্বাভাবিক নয়! প্রকৃতপক্ষে এর জন্য আমরাই দায়ী। আমরাই ত নিত্য নূতন ফ্যাসান তুলে নতুন বিলাসের সামগ্রী আমদানী করচি! আমরা বেশী পয়সা দিয়ে একটু ভাল জিনিষ কিনি আর এরা তা কিনতে পারে না বলেই জাপানী সস্তা জিনিষ ব্যবহার করে, দু দিনেই যা নষ্ট হয়ে যায়।"

মনোরমা জিজ্ঞাসা করিল—"এদের নিয়ে তুমি কি করতে চাও ?"

"এদের আমি মানুষ করে তুলব মনু, এদের আমি বুঝিয়ে দেব যে এরা শুধু জমিদারের খাজনা দিয়ে, মহাজনের সুদ জুগিয়ে, অনাহারে গুরু পরিশ্রমে মরে যাবার জন্যই দুনিয়ায় আসে নি—এরা এসেচে দেশের সম্পদ বাড়াতে, মানব জীবন সার্থক ও সফল করে তুলতে।"

"একা তুমি পারবে তা ?"

"আমি একা নই মনু। কাজের লোক সব গড়ে উঠচে, স্বার্থত্যাগী কর্ম্মীর দল তৈরী হচ্ছে—যারা দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করবে—অত্যাচার, উৎপীড়ন, অজ্ঞতা হতে মুক্ত করে মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব দান করবে।"

মনোরমা আর কোন কথা কহিল না—ধীরে ধীরে স্বামীর কাছে সরিয়া গিয়া তাহার পদধূলি মাথায় লইল। সতীশ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ওকি রে পাগলি !"

"একদিন তোমার এই কাজ অবজ্ঞা করেছিলুম—একদিন অভিমান ভরে তোমায় ভাল করে বুঝতে চাইনি—ভেবেছিলুম, বিধাতা এমন

লোকের সঙ্গে কেন মিলিয়ে দিলেন! ঠাকুরঝির মুখে তোমার কথা শুনে মনে মনে হেসে একদিন বলেছিলুম—ভাই বোন খুব বড় বড় কথা বলে। এখন আমার ভুল ভেঙেছে—চোখ ফুটেছে—তোমার মাঝে আমি আমার দেবতার সন্ধান পেয়েছি।”

“ছি মনু, দেবতার আদর্শ কি এত খাট করতে হয়?” বলিয়া সতীশ মনোরমার মুখপানে চাহিল।

মনোরমা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সতীশের বুকে মুখ লুকাইল।

বাড়ী ফিরিয়া মধু দেখিল, তাহার স্ত্রী বিষণ্ণ ভাবে কুটীর দুয়ারে বসিয়া রহিয়াছে! মধু দাওয়ায় বসিয়া পড়িল—তাহার স্ত্রী তামাক সাজিয়া কল্কেটা তাহার সম্মুখে রাখিল। মধু জিজ্ঞাসা করিল—“মুখটা এমন ভার করে রয়েছিস কেন রে?”

“গাছটার দিকে চাইতে বুকটা পুড়ে যাচ্ছে; আর ফল ধরবে না।”

“দা’ঠাকুর শুনে ত চটেই লাল—কেবল বলে ‘দিলি কেন’? বুড়ো কর্ত্তার কাছে আমাদের কথা কইতে কইতে একেবারে কেঁদে ফেল্লেন।”

“দা’ঠাকুরের দয়ার শরীর!”

“বুড়ো কর্ত্তা বল্লেন, চক্রবর্ত্তীকে আর যেন আমরা কিছু না দেই।”

“দিতে কি আমরা চাই? জোর করে কেড়ে নেয় যে।”

মধু তামাক খাইতে খাইতে বলিল—“আরে, আমায় বুঝি আজ খেতে দিবিনে?”

“হাত পা না ধুয়েই খাবে নাকি?”

মধু পায়ে খানিকটা জল ঢালিয়া দিয়া আহারে বসিল। সকাল বেলার রান্না করা ভাত ছিল। একখানা পিতলের থালায় ভাত ঢালিয়া দিয়া মধুর স্ত্রী তাহার উপর তেঁতুল ও কাঁচা লঙ্কা দিয়া ভাল করিয়া

মাখিল, পরে মুখে দিয়া কহিল—বাঃ দিব্যি হয়েছে রে।" খাইতে খাইতে সে কহিল—"হাঁড়িটা একবার দেখা ত।"

"তুমি খাওনা, লাগলে দেব এখন।" বলিয়া মধুর স্ত্রী কষ্টের হাসি হাসিল।

মধু কহিল—"রোজ রোজ কেবল তোর চালাকি। হাঁড়ীটা দেখানা ?"

"হাঁড়ী দেখে কি হবে ? ভাত আর নেই !"

"তবে সব ভাত আমায় দিলি কেন ?'

"ঐ দুটি না খেলে তোমার শরীর ভাল থাকবে কেন ? যে পরিশ্রম কর !"

"আর তুই বুঝি না খেয়েই বাঁচবি ?"

মধুর স্ত্রী কহিল—"আমার অসুখ করেছে—আমি খাবনা।"

মধু উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার স্ত্রী বলিল—"করলে কি ? মুখের ভাত ফেলে উঠলে ?'

কর্কশকণ্ঠে মধু কহিল—"উঠব না'ত কিরে ? তুই খাবিনে, উপোস করে মরবি—আর আমি বুঝি তাই দেখব ?"

"আমার ক্ষিদে নেই" বলিয়া মধুর স্ত্রী অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। তাহার কপোল বহিয়া বড় বড় দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

মুখ ধুইয়া মধু কহিল—"তোকে ঐ ভাত খেতেই হবে।"

"তুমি পেটে ক্ষিদে রেখে উঠে এলে—আর আমি কেমন করে খাব !"

"তোকে খেতেই হবে।"

"আমি খাব না।"

ক্রুদ্ধ হইয়া মধু কহিল, "না খেলে মেরে হাড় ভেঙে দেব !"

"খেতে দিতে পার না তাই খাইনা, তা আবার মারের ভয় দেখাও কি ?"

"এত বড় কথা !" বলিয়া মধু স্ত্রীকে বিষম প্রহার করিল। যেমন অনাহার তেমন প্রহারও তাহার ভাগ্যে আজ কিছু নূতন নয়। সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মাঝে মাঝে তাহাকে এসব সইতেই হয়।

রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেল। মধুর চক্ষে নিদ্রা নাই। ছেঁড়া কাঁথার উপর পড়িয়া-সে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। তাহার স্ত্রী যেমন ছিল তেমনই বসিয়া রহিল। তৈলের অভাবে মৃৎপ্রদীপ জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিভিয়া গেল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

আনন্দমোহন গায়ত্রীকে লইয়া গাঁয়ে আসিয়া নিজের বাড়ীতেই বাস করিতেছেন। সতীশের কাজের পরিচয় পাইয়া পিতা ও পুত্রী উভয়েই বিস্মিত হইয়াছে। আশ্চর্য্য কর্ম্ম-কৌশল তরুণ এই যুবকের। এত অল্প সময়ের মাঝে কেমন করিয়া সে সমগ্র পল্লীটাকে এমন নব-ভাবে মাতাইয়া তুলিল? মোজা ও গেঞ্জি বুনিবার কল এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় সরঞ্জাম আসিয়া পঁহুছিতেই সতীশ নিজের বাড়ীর একটা প্রকাণ্ড কামরায় বয়ন-বিদ্যালয় খুলিয়া দিল। সতীশের নির্দ্দেশ মত তাহার মাতা, অভাবগ্রস্ত কয়েকটি ভদ্র মহিলাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সময় সময় সাহায্য পাইতেন বলিয়া তাঁহারা সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

গায়ত্রী তাঁহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিল যে, যত্ন সহকারে তিন মাস মাত্র কাজ শিখিলে তাঁহারা এমন সুন্দর সুন্দর মোজা ও গেঞ্জি বুনিতে সক্ষম হইবেন যে, তাহা বিক্রয় করিয়া তাঁহারা নিজ নিজ পরিবারের অভাব মোচন করিতে পারিবেন। কাজ শিখিলেই তাঁহাদের প্রত্যেককে এক একটী করিয়া কল দেওয়া হইবে। তাঁহাদের আবশ্যকীয় সূতা প্রভৃতি সমস্তই সতীশ যোগাইবে। মাসের শেষে তাঁহারা নিজেদের তৈরী জিনিষ সতীশের কাছে পাঠাইয়া দিলে সে তাহা বিক্রয় করিবার বন্দোবস্ত করিবে এবং বিক্রয়-লব্ধ অর্থ হইতে সূতার দাম এবং কলের মূল্য বাবদ সামান্য কিছু রাখিয়া দিয়া উদ্বৃত্ত অর্থ তাঁহাদের পাঠাইয়া দিবে।

এই বন্দোবস্ত বিশেষ সুবিধাজনক হইবে বুঝিতে পারিয়া তাঁহারা সকলেই সানন্দে সম্মতি জানাইলেন এবং প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে সতীশদের

বাড়ীতে সমবেত হইতে লাগিলেন। গায়ত্রী খুব যত্নের সঙ্গে তাঁহাদের শিখাইতে আরম্ভ করিল। বয়ন-বিদ্যালয়ের কার্য্য বেশ সুচারুরূপে চলিতে লাগিল। ক্রমে এই সংবাদ গ্রামময় রটিয়া গেল।

হলধর খুড়ো, মহিম মুখুজ্যে প্রভৃতি হিন্দুয়ানী রক্ষা করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া তাঁহারা বলিয়া আসিলেন যে আনন্দমোহন ব্রহ্মজ্ঞানী, অখাদ্য ভোজন করে। তাহার কন্যা জুতা-মোজা পরিয়া বিবি সাজিয়া স্বাধীনভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়—ইংরাজীতে কথা বলে এবং বুড়া বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত রহিয়াছে। সতীশের সঙ্গে মিলিয়া আনন্দমোহন ও তাহার কন্যা এই গ্রামে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং সেই উদ্দেশ্যেই সতীশের বাড়ীতে তাহারা একটা বয়ন-বিদ্যালয় স্থাপন কহিয়াছে। সুতরাং কেহ যদি আনন্দমোহন এবং তাহার কন্যা অথবা সতীশ ও তাহার পিতার সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চায়, তাহা হইলে সমাজে সে পতিত হইবে—তাহার ধোপা, নাপিত সকলই বন্ধ করা হইবে।

ইহাদের এইরূপ ঘোষণা প্রচারের ফলে অনেকেই বয়ন-বিদ্যালয়ে যোগ দিতে চাহিলেন না। কাহাকেও আসিতে না দেখিয়া গায়ত্রী বলিল—"আমরা এসেই সব পণ্ড করলুম সতীশবাবু!"

সতীশ কহিল—"কিছু চিন্তা করবেন না আপনি, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

গায়ত্রী উৎসাহের সঙ্গে মনোরমা ও চাঁপাকে মোজা ও গেঞ্জি বুনা শিখাইতে লাগিল।

দিনের কার্য্যাবসানে খামার হইতে ফিরিয়া সতীশ প্রতি সন্ধ্যায় আনন্দমোহনের বাটী যাইত। কখনো কখনো তারানাথও উপস্থিত থাকিতেন। সকলে মিলিয়া তাঁহারা পল্লী সম্বন্ধীয় নানারূপ আলোচনা করিতেন।

গায়ত্রী যখন বুঝিল যে, তাহার পোষাক পরিচ্ছদ এবং চাল-চলন সমালোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন সে গ্রামের পথে বাহির হইতে সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিল। ক্রমে সে জুতা ব্যবহার ছাড়িয়া দিল,এবং পরিচ্ছদ বাহুল্য বর্জ্জন করিল। সতীশ একদিন জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল—"আমি ভেবে দেখলুম, সতীশবাবু, যাদের সঙ্গে আমার মিলে মিশে কাজ করতে হবে, ভাবে ও কাজে, আচারে ও পোষাকে আমি যদি তাদের চাইতে ভিন্ন ধরণের হই, তাহলে তারা তো আমার সঙ্গে ভাল করে মিলতে পারবেই না। তাই যতটা পারি তাদের মত হতে চেষ্টা করচি।"

সতীশ শুনিয়া আনন্দিত হইল এবং গায়ত্রীকে উৎসাহ দিয়া বলিল যে শীঘ্রই সকল গোল চুকিয়া যাইবে এবং স্কুলের কার্য্য রীতিমত চলিবে।

চাঁপা এখন গায়ত্রীর সঙ্গেই থাকে। সে বড় আশায় পিতার কারা মুক্তির দিন গণনা করিতেছিল, কিন্তু একদিন সংবাদ আসিল যে, ভৈরব ভব-কারা হইতেই চিরদিনের তরে মুক্তিলাভ করিয়াছে। চাঁপা প্রথমে অধীর হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু গায়ত্রীর স্নেহ-প্রলেপে ক্রমে তাহার অন্তরের জ্বালা কমিয়া আসিল।

বয়ন-বিদ্যালয়ে যাহারা যোগ দিয়াছিল, তাহারা অভাব-পীড়িতা। সতীশ এবং তাহার জননীর গোপন সাহায্য ব্যতীত তাহাদের অনেকেরই চলে না। প্রথম দিনকতক তাহারা সমাজ-চ্যুতির আশঙ্কায় সতীশের বাড়ীতে যাইত না, কিন্তু যাহারা সমাজ-চ্যুত করিবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়াছে—অভাবে সাহায্য করিতে তাহাদের কেহই নিকটে আসিবে না। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে তাহাদিগকে সতীশের সাহায্য লইতেই হইবে। সুতরাং একে একে তাহারা পুনরায় বয়ন-বিদ্যালয়ে যোগদান করিল।

গায়ত্রী একদিন বলিল—"আপনাদের সমাজের উন্নতি করতে না পারলে, দেশের উন্নতি আপনারা করতে পারবেন না। রাষ্ট্র-নীতির আলোচনা করলেই শুধু চলিবে না—সমাজ শরীর হতে কুসংস্কারের আগাছাও সব তুলে ফেল্‌তে হবে। অন্য সব কাজ ফেলে রেখে আগে আপনাদের তাই করা উচিত।"

সতীশ কহিল—"দেশের সব লোক প্রকাণ্ড কোন সভায় সমবেত হয়ে, সমাজ-সংস্কার অথবা রাষ্ট্রীয় শাসন-সংস্কার কোনটা আগে করা উচিত তাই স্থির করে কাজে প্রবৃত্ত হয় না। কখন কোন মুহূর্ত্তে কোন সামান্য ঘটনা অবলম্বন করে দেশের কর্ম্মশক্তি কেমন করে প্রবুদ্ধ হয়ে ওঠে, তা' বলা কঠিন। সমাজ যদি নিষ্ঠুর পেষণে আমাদের নিরন্তর পীড়নই করত, তা'হলে হাজার চেষ্টা করে আজ ব্রাহ্মণ অথবা গোঁড়া হিন্দুরা ধ্বংসের কবল হতে সমাজকে রক্ষা করতে পারতো না। সমাজকে ভেঙে গুঁড়ো করে ফেল্‌বার জন্য দেশের লোক অনবরত তার বুকে ঘা মারত আর তার শক্তিও হতো অমোঘ।

"সামাজিক পীড়নের চাইতেও রাষ্ট্রীয় তাচ্ছিল্য ও অবমাননাই যে আমাদের বুকে বেশী ব্যথা দিচ্ছে। তাই আমরা যে নবজীবনের স্পন্দন আজ অনুভব করচি, তার প্রেরণা এসেছিল প্রথমে রাষ্ট্রীয় সংঘর্ষ হতেই। আমরা ঘুমিয়ে ছিলুম, জেগে চেয়ে দেখলুম রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের তরঙ্গ তাড়নায় আমাদের জাতীয়-জীবন-তরণী হাবুডুবু খাচ্চে। আমরা পাল তুলে দিলুম! সমাজ বিস্ময়ে চেয়ে দেখলে—কিন্তু বাধা দিল না সমুদ্র পাড়ি দিতে। সে তার বন্ধন-রজ্জু শিথিল করে রাষ্ট্রীয় জীবন পুষ্টির সহায়তা করলে। সমাজ যখন বাধা কিছু দিচ্ছে না, তখন যে পথে আমরা এগিয়েছি, তা পরিত্যাগ করে আবার নতুন পথে যাত্রা সুরু করবার প্রয়োজন কি?"

গায়ত্রী কহিল—"কিন্তু সমুদ্র পাড়ি দিয়ে জ্ঞান ও কর্ম্মের পতাকা হাতে করে যারা দেশে ফিরে আসচে,. আপনার সমাজ তাদের সংক্রামক ব্যাধির মত দূরে রাখবার চেষ্টা করচে। কেন, এমন কি অপরাধ তারা করেছে ?"

আনন্দমোহন একখানা বই পড়িতেছিলেন। গায়ত্রীর এই শেষোক্ত কথাটি শুনিয়া বইখানা মুড়িয়া রাখিয়া বলিলেন—"কেউ কেউ যে অপরাধ করে, সুধীরকে দেখে কি তা বোঝ না ? কত আশা বুকে করেই না তাকে আমেরিকায় পাঠিয়েছিলুম। ভেবেছিলুম দেশে ফিরে এসে কত কাজই সে করবে। কিন্তু পাঁচ বছরে তার কত পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। দেশের কোন জিনিষই আর তার ভাল লাগেনা। সে চায় বাংলা দেশটাকে মার্কিনের মতই গড়ে তুলতে। এই অপরাধটুকু কিন্তু উপেক্ষা করা সমীচীন নয়। সতীশ ত ঠিকই বলেছে, মা। কাজের প্রবৃত্তি যখন জাগ্রত হয়েছে, তখন কোনটা আগে করা উচিত বা অনুচিত তাই নিয়ে দ্বন্দ্ব করে সময় ও সুযোগ না হারিয়ে কাজে লেগে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।"

প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় তাহারা ঐরূপ নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেন। মাঝে মাঝে তারানাথও তাহাতে যোগদান করিতেন।

গায়ত্রী এবং তাহারই মত শিক্ষিতা মেয়েদের সম্বন্ধে সতীশের যে একটা ভুল ধারণা ছিল,তাহা সম্পূর্ণ বিদূরিত হইল। গায়ত্রীও বুঝিল হিন্দু-সমাজের বিরুদ্ধে যাহারা কেবলই গালি বর্ষণ করে, তাহারা কতদূর ভ্রান্ত। প্রাণের স্পন্দন যেখানে পাওয়া যায়,সেখানে সবই ঠিক রহিয়াছে, রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে যেখানে তাহা, সেইখানেই বিকৃতি ও আবিলতা।

গায়ত্রী আসিবার পর হইতে সতীশের কর্ম্মশক্তি দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সে সারাদিন মাঠে কাজ করে, কৃষক পল্লীতে বাড়ী বাড়ী

ঘুরিয়া তাহাদের অসুখ অসুবিধার প্রতিবিধান করে, ছেলের দলকে উৎসাহিত করিয়া তাহাদের অবসর কালে গ্রামহিতকর কার্য্যে নিযুক্ত করে। গায়ত্রী এই যুবকের অদ্ভুত কর্ম্মশক্তির পরিচয় পাইয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছে। সে অনেকদিন এই কথাই ভাবিতেছিল যে, বাংলার প্রতি পল্লীতে যদি সতীশের মত একটী করিয়া যুবক থাকিত তাহা হইলে অনেক অসুবিধাই বিদূরিত হইত।

সতীশ দেখিল শিক্ষিতা এই যুবতীর চিত্ত কত কোমল, কেমন গাঢ় স্নেহে পরিপূর্ণ! দেশ-জননীর সেবা করিবার জন্য কি তার ব্যাকুল আগ্রহ। এমনভাবে নূতন স্থানে, নূতন সমাজে আসিয়া নিন্দা গ্লানি নীরবে সহ্য করিয়া পল্লীর গৃহস্থ বধূদের দুঃখ কষ্ট দূর করিবার এমন শুভ প্রচেষ্টা আর কখনো সে দেখে নাই।

পরস্পরের প্রতি একটা আন্তরিক শ্রদ্ধা থাকিবার জন্য তাহাদের মাঝে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। একই মায়ের সেবায় তাহারা আত্মদান করিয়াছে, একই মন্ত্রে উভয়ে দীক্ষিত, তাহাদের বয়সের ধর্ম্ম এক, জীবনেরও একই লক্ষ্য। সুতরাং একে অন্যের কাজে মুগ্ধ হইবে না কেন? নিজেদের অগোচরে তাহারা একে অন্যকে প্রতি মুহূর্ত্তেই আকর্ষণ করিতেছিল।

সতীশ এতদিন গ্রামের পুরুষদের চিত্তেই কেমন এক নব ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিল, এক্ষণে গায়ত্রী আসিয়া অন্তঃপুরিকাদের সম্মুখেও এক নূতন আদর্শ স্থাপন করিল। প্রথম প্রথম অনেকেই গায়ত্রীকে দেখিয়া দূর হইতে সরিয়া পড়িত—কিন্তু পিত্রালয়ে আসিয়া কমলা যখন তাহাকে লইয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিতে লাগিল, তখন গায়ত্রীর কথাবার্ত্তা ও চাল-চলনে বিরুদ্ধ ভাবের কোন পরিচয় না পাইয়া একে একে অনেকেই তাহার সহিত প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইল। যাহারা গায়ত্রীর নিকট

বয়ন-কার্য্য শিক্ষা করিয়াছিল তাহাদের তৈরী জিনিষগুলি লইয়া সে তাহার বন্ধুদের নিকট প্রেরণ করিত। তাঁহারা উচিত মূল্যে এই সকল দ্রব্য ক্রয় করিয়া গৃহ-শিল্পের পোষকতা করিতেন।

এমন করিয়াই সতীশ ও গায়ত্রীর চেষ্টায় অভিভাবক-বিহীন কয়েকটী দরিদ্র ভদ্র পরিবারের অন্নাভাব বিদূরিত হইল। গায়ত্রী তাহাদের লেখা পড়াও শিখাইতেছিল। সপ্তাহে দু'একদিন একত্র মিলিত হইয়া তাহারা রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি সদ্‌গ্রন্থ এবং নানারূপ গল্পের বই পড়িয়া অবসরকাল আনন্দে অতিবাহিত করিত। তাহাদের বৈচিত্র্য-বিহীন একঘরে জীবনের দিনগুলি যে দুর্ব্বহ বোঝা তাহাদের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়াছিল, তাহার অবসানে, তাহাদের চিত্ত হইতে দুর্ভাবনার তমোরাশি অপসৃত হইল। সংসারের সকলের তাচ্ছিল্য ও অবমাননা সহ্য করিয়া, সকল রকম উৎসব আনন্দ হইতে নিজেদের বঞ্চিত রাখিয়া যে সকল বিধবা রমণী অন্তরের ক্ষতে জর্জ্জরিত হইয়া পরুষ-বাক্য প্রয়োগে ও কলহ-রোলে পাড়া কাঁপাইয়া তুলিত, গায়ত্রী তাহাদের ক্ষতস্থানে অমৃতের প্রলেপ লেপিয়া দিয়া তাহাদের বুকের জ্বালা নিবারণ করিল।

কমলা একদিন সতীশকে বলিল—"দাদা, তোমার ক্ষেত খামারগুলো কি আমাদের দেখাতে পার না? সতীশ উত্তর করিল—"সে আর এমন শক্ত কাজ কিরে? চলনা আজই তোদের দেখিয়ে আনি।"

সেইদিন অপরাহ্নেই কমলা, মনোরমা, গায়ত্রী এবং চাঁপাকে লইয়া সতীশ খামার দেখাইতে চলিল। মেয়েদের সকলের হাতেই এক একটা ছোট ছোট বেতের চুপড়ী ছিল। গ্রাম অতিক্রম করিয়া যখন তাহারা প্রান্তরের মধ্যে গিয়া পৌঁছিল, তখনো বেশ রৌদ্র ছিল। সতীশ তাহাদিগকে দূর হইতে ধান্যক্ষেত্র দেখাইয়া সব্জীবাগে প্রবেশ করিল।

অপেক্ষাকৃত অনেকটা জমি কাঁটা তারে ঘিরিয়া সতীশ এই উত্থানটি রচনা করিয়াছে। উত্থানে সীমা বেষ্টন করিয়া কদলী বৃক্ষের সারি রোপিত হইয়াছে। উত্থানের ভিন্ন ভিন্ন অংশ বাঙালীর নিত্য ব্যবহার্য্য তরীতরকারীর চাষ করা হইয়াছে। সতীশ প্রভৃতিকে দেখিয়া উত্থানপালক উদ্ধবচন্দ্র প্রণাম করিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। উদ্ধবের বয়স পঞ্চাশ বৎসরের উপর ; দশম বর্ষিয় এক পৌত্র ব্যতীত সংসারে তাহার আর কেহ নাই। পৌত্রকে লইয়া উদ্ধব এই উত্থানের কোণে একখানি কুঁড়ে ঘরে বাস করে এবং রাত্রি দিবা কড়া পাহারায় নিযুক্ত থাকে। তাহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া এই উত্থান হইতে কেহ একগাছি তৃণও লইতে পারে না।

চারিদিক ঘুরিয়া দেখিয়া কমলা বলিল—"এই অল্পকালের মাঝে এত কাজ তুমি কি করে করলে, দাদা ?

গায়ত্রী কহিল—"যে দিকেই চাই, চোখ আর ফেরাতে ইচ্ছা করে না, সতীশ বাবু। সব গাছগুলিই সজীব, সতেজ ও ফলফুলে শোভিত !"

"তুমি যে একেবারে চুপ করে রইলে ?" বলিয়া সতীশ মনোরমার দিকে চাহিল।

তাহার মুগ্ধদৃষ্টি স্বামীর মুখের উপর নিবদ্ধ ছিল—তাহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল শ্রদ্ধা ও ভালবাসার নিদর্শন। স্বামী তাহার দিকে চাহিতেই সে হাসিয়া গায়ত্রীর হাত ধরিয়া বলিল—"চল দিদি, ঐ পুকুরের ধারে গিয়ে বসি।"

উত্থানের মাঝখানে একটা পুষ্করিণী ছিল। তাহারা সকলে মিলিয়া তাহার তীরে ঘাসের উপর বসিয়া মৎস্যকুলের ক্রীড়া দেখিতে লাগিল। কিয়ৎকাল বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কমলা বলিল—"দূর ছাই !

চুপটি করে বসে থাকৃতে এখানে এয়েছি নাকি? চল ভাই গায়ত্রী, আমরা বাগানটা ঘুরে আসি। দাদা ততক্ষণ বসে তার বউ পাহারা দিক।"

মনোরমা কহিল—"বাঃ আমি বুঝি যাবনা?"

"তোমার হেঁটে এসেই পা বেদনা করচে, শেষটায় বাড়ী ফিরতে ডুলি লাগবে। তুমি বোস।"

তাহার উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া কমলা গায়ত্রী ও চাঁপাকে লইয়া প্রস্থান করিল।

তাহারা একখণ্ড ইক্ষু-ক্ষেত্রের অন্তরালে অদৃশ্য হইলে মনোরমা স্বামীকে বলিল—"চলনা, ওদের কাছে যাই।"

"বোসনা একটু!"

সেই পুষ্করিণীর তীরে শ্যাম-তৃণ-শয্যায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় থাকিয়া সতীশ পত্নীর মুখপানে চাহিয়া দেখিল অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিম আভা মনোরমার গণ্ডের লালিমা আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

মনোরমা কহিল—"সত্যই তুমি যাদুকর।"

"নতুন যাদুবিদ্যার আবার কি পরিচয় দিলুম, মনু?"

"এমন সুন্দর একখানি বাগান—ঠিক যেন ছবি!"

"তোমরা সবাই এই বাগানের শোভা দেখে মুগ্ধ হয়েছ। আমার চোখেও যে ভাল লাগে না, তাও নয়। কিন্তু দেখার চাইতেও আমি বেশী আরাম পাই এই ভেবে যে, হতভাগ্য কৃষকদের আর শুধু নুন ভাত খেয়ে থাকতে হবে না—তারাও পারবে তাদের খাদ্য সুস্বাদু ও রুচিকর করতে!"

মনোরমা স্বামীর কাছে সরিয়া বসিল। সতীশ তাহার ললাটে একটিবার চুম্বন করিল।

ইক্ষু-ক্ষেত্রের অপর পার্শ্বে বেগুনের ক্ষেতে গায়ত্রী প্রভৃতি বেগুন তুলিতেছিল। ইক্ষুসারির ফাঁক দিয়া গায়ত্রীর দৃষ্টি আসিয়া পড়িল প্রণয়-বিহ্বল এই দম্পতীর উপর। গায়ত্রীর চক্ষু আপনা হইতে মুদ্রিত হইয়া গেল—সমস্ত মুখমণ্ডল রক্তের আধিক্যে গরম হইয়া উঠিল। তাহার বাম হস্তের চুপড়ীটা মাটীতে পড়িয়া গেল। কমলা মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ওকি হ'ল দিদি ?" বেগুনের কাঁটার খোঁচায় গায়ত্রীর আঙ্গুল চিরিয়া রক্ত ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল, গায়ত্রী কমলাকে তাহাই দেখাইল।

"তোমরা সহরের মেয়ে একেবারে অকেজো" বলিয়া কমলা মাটি হইতে বেগুনগুলি কুড়াইয়া গায়ত্রীর চুপড়ী পুনরায় ভরিয়া দিল এবং গায়ত্রীর হাত ধরিয়া বলিল—"চল এবার ফেরা যাক।" চাঁপা তাহাদের অনুগমন করিল।

তাহাদের ফিরিতে দেখিয়া মনোরমা স্বামীর নিকট হইতে সরিয়া গেল। কাছে গিয়ে কমলা কহিল—"চল দাদা, বাড়ী যাই।"

মনোরমা বলিল—"বেশত ! নিজেরা সব চুপড়ী ভরে তরকারী নিয়ে যাচ্ছেন—আর আমি বুঝি খালি হাতে যাব।"

কমলা উত্তর করিল—"তুমি যে ভাই দাদাকে ছেড়ে যেতে চাইলে না।"

"মিথ্যে কথা বলোনা ! আমিত যেতেই চেয়েছিলুম।" উদ্ধবচন্দ্রকে নিকটে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া মনোরমা চুপ করিয়া রহিল।

কমলা জিজ্ঞাসা করিল—"উদ্ধব দা তোমার পৌত্রটিকেত দেখলুম না !"

"তাকে গাঁয়ে পাঠিয়েছি দিদি ঠাকরুণ, এই এল বলে !"

সতীশ উঠিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কিছু বলতে চাও উদ্ধব?"

"দয়া করে যদি আপনারা আমার আঙিনায় একটিবার পায়ে ধুলো দেন।"

"কেন উদ্ধব, ব্যাপার কি?"

"আজ্ঞে দু'টো ফল তুলে রেখেছি।"

"বেশ চল!" বলিয়া সতীশ অগ্রসর হইল। মেয়েরাও তার পিছনে পিছনে চলিল।

উদ্ধবের কুটীর দুয়ারে আসিয়া সকলে দেখিল যে কলাপাতের উপর কতকগুলি পেঁপে আর সুপক্ব কদলী রহিয়াছে—কাছেই খুব বড় বড় কয়েকটি ডাব এবং একখানা কাটারী।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল—"এসব দিয়ে কি হবে উদ্ধব?"

মাথা চুলকাইয়া উদ্ধব উত্তর করিল—"একটুখানি প্রসাদ পেতে চাই, দাদা ঠাকুর।"

কমলা বলিল—'হাঁ, সে বেশ হবে। এও একরকম চড়িভাতি—না দিদি?"

গায়ত্রী বড়ই অন্যমনস্ক ছিল। সে কোন কথা বলিল না। কমলা কহিল—"তাইত উদ্ধব দা', জলের বন্দোবস্ত কিছু করনি যে।"

কুটীরাভ্যন্তর হইতে একটি পিতলের ঘটি আনিয়া কহিল—"আমার ছোঁয়া জল ত তোমরা খাবে না, দিদি।"

"দাদা, তুমি একঘটি জল নিয়ে এস।" বলিয়া কমলা কাটারী দিয়া পেঁপের খোসা ছাড়াইতে লাগিল।

ডাব লইয়া সতীশ আসিয়া দেখিল চারিটি পাথরের গ্লাস সাজান রহিয়াছে। বিস্মিত হইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—"এসব কোথায় পেলিরে, কমল?"

"তোমার এই উদ্ধব বড় সহজ লোক নয় দাদা। পৌত্রকে আমাদের বাড়ী পাঠিয়ে এগুলি আনিয়েছে।"

"তারা গেল কোথায় ?"

"কি যেন কাজ আছে বলে তারা দুইজনে ঐদিকে চলে গেল।"

সতীশ চারিদিকে চাহিয়া উদ্ধব অথবা তাহার পৌত্রের কোন সন্ধান পাইল না।

কমলা পেঁপেগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া কদলীর খোসা ছাড়াইয়া সতীশকে বলিল—"তুমি বসেঁ পড় দাদা।"

সতীশ ক্ষিপ্রহস্তে কাটারী দিয়া ডাব নারিকেলগুলির মুখ খুলিয়া দিল। কমলা একখণ্ড পাতায় পেঁপে ও কদলী লইয়া সতীশের সম্মুখে রাখিল এবং গ্লাসে ডাবের জল ঢালিয়া দিল।

সতীশের খাওয়া শেষ হইলে কমলা বলিল—"এখন তুমি বৌদির ওই চুপড়ীটায় করে কিছু তরকারি তুলে আন।"

সতীশ যাইতে যাইতে পিছনে ফিরিয়া কহিল—"দেখিস সবটা যেন খেয়ে ফেলিস্‌নে। উদ্ধব বেচারা কিন্তু প্রসাদ পাবে।"

মনোরমা নিম্নস্বরে কহিল—"সবাই যেন ওঁরই মত পেটুক !"

অর্দ্ধঘণ্টা পরে সকলকে লইয়া সতীশ গৃহে ফিরিল। কমলা, মনোরমা, চাঁপা সকলেই বলিল যে, এমন আমোদ জীবনে কখনো তাহারা পায় নাই। ভদ্রতার খাতিরে গায়ত্রী তাহাতে সায় দিলেও অন্তরের সঙ্গে সমর্থন করিতে পারিল না।

রাত্রিকালে বিছানায় পড়িয়া গায়ত্রী ভাবিতে লাগিল—কেন এমন হইল ? এমন করিয়া তাহার সারাটা চিত্ত ক্ষুধিতের মত সহসা আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিল কেন ? নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া এতদিন কর্ম্মের পাল তুলিয়া সে তাহার জীবন-তরণী অবাধে চালাইয়া লইয়াছিল আনন্দ

বারিধির বক্ষ চিরিয়া—আজ কেন ক্ষ্যাপা বাতাসের এই উদ্দাম নৃত্য সে তরণীর মুখ এমন বিপরীত দিকে ফিরাইয়া দিল ?

চক্ষু মুদ্রিত করিতেই বার বার গায়ত্রীর মানস-পটে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল সতীশের প্রেমপূর্ণ সেই ভঙ্গিমা, অপরাহ্নে ইক্ষু সারির ফাঁক দিয়া চকিতে যাহা সে দেখিয়া ফেলিয়াছিল। কতদিন কত বিভিন্ন মূর্ত্তিতে সতীশকে সে দেখিয়াছে। দেখিয়াছে সে সতীশের মুখে বিশ্বাস ও দৃঢ়তার ভাব, যখন সুধীরের সহিত তর্ক করিয়া উপযুক্ত প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা সে আপনার মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছে—দেশের ও দশের পুঞ্জীভূত দুঃখ দুর্দ্দশার কথা বলিতে বলিতে অশ্রুপূর্ণ নয়নে যখন সে আনন্দমোহনের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে, তখনো গায়ত্রী সতীশকে দেখিয়াছে করুণার অবতার রূপে—সুদখোর মহাজনদের অত্যাচার এবং ধনবানদের অবিচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার সময় সতীশের মুখে ও চোখে যে ঘৃণা ও বিরক্তির ভাব প্রকাশ পাইয়াছে গায়ত্রী তাহাও দেখিয়াছে। যখনই যেমন দেখিয়াছে সতীশকে গায়ত্রী, তখনই তাহা শোভন ও সুন্দর বলিয়া মনে করিয়াছে। কিন্তু আজ যাহা দেখিয়াছে তাহার মাঝে এমন কি বিশেষত্ব রহিয়াছে, যাহা তাহার বুকের মাঝে এমন বিষম তোলপাড় সুরু করিয়া দিয়াছে ? স্বামী-স্ত্রীর প্রণয়-প্রসঙ্গ সে কেতাবে পড়িয়াছে—পটের গায়েও অঙ্কিত দেখিয়াছে, কখনো ত এমন ব্যাকুলতা, এমন দৈন্য উপলব্ধি করিয়া হাহা রবে কাঁদিয়া উঠে নাই ! কেন তাহার মনে হইতেছে যে জগতের সমস্ত সুখ, সকল মাধুর্য্য লুক্কায়িত রহিয়াছে নিবিড় ঐ প্রেমেরই অন্তরালে ?

বিনিদ্র রজনীর সমস্তটুকু সময় গায়ত্রী এমনই সব প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিল না। যে প্রবৃত্তি এতদিন সুপ্ত ছিল বলিয়া গায়ত্রী তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত

উপলব্ধি করিতে পারে নাই, আজ তাহা জাগিয়া তাহার সমস্ত হৃদয় অতৃপ্ত একটা বাসনার ব্যাকুলতায় ভরিয়া দিয়াছে !

সতীশকে সে চায়, আরো—আরো কাছে—নইলে কিছুতেই তাহার চলিবে না, তাহার জীবনের সকল কার্য্য বিফলতায় ডুবিয়া তলাইয়া যাইবে। পরক্ষণেই গায়ত্রী ভাবিল, সতীশ তো বিবাহিত, তাহাকে যতটুকু কাছে সে পাইয়াছে, তাহার বেশী দাবী করিবার অধিকার তাহার নাই। নাই বা থাকিল তাহার এতটুকু অধিকার, হোক না সে সমাজে নিন্দনীয়া—তবু সে সতীশকে একেবারে আপন করিয়া লইতে চায়। সতীশের চিন্তা কিছুতেই সে ভুলিতে পারিবে না—সে চিন্তা মদিরার মত ঝাঁঝাল হইলেও তাহাতে নেশার আরাম আছে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সতীশ নিজের কাজ ও ব্যবহার দিয়ে গাঁয়ের নরনারীর হৃদয় জয় করিতেছে দেখিয়া হলধর খুড়ো একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল। এই গাঁয়ে মোড়লী করিয়া তাঁহার চুল পাকিয়াছে, দাঁত পড়িয়াছে আর এখন কি না সেদিনকার একটা ছেলে আসিয়া সকলের প্রিয় হইয়া উঠিল, আজ গাঁয়ের প্রায় সব লোকই সম্পদে বিপদে সতীশের কাছে ছুটিয়া যায়, তাহারই পরামর্শ চায়, সাহায্য প্রার্থনা করে, প্রবীণদের দিকে একটিবার ফিরিয়াও চায় না!

ক্রমে বাংলার সমস্ত যুবক ও বালকদের উপর হলধর খুড়ো ভয়ানক চটিয়া গেলেন—আর সেই ক্রোধের প্রথম দাপট সহিতে হইল হতভাগ্য চারুকে। হলধর চারুর পিতাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, অভিভাবকদের কোন কথাই ছেলেরা আর শুনিবে না। এই গ্রামে সতীশই হইতেছে সেই দলের নেতা আর চারু তাহার প্রধান সহকারী। সুতরাং চারুর উদ্ধত প্রকৃতি দমন করিতে না পারিলে মঙ্গলের আশা নাই। চারুর পিতা তাই নির্ম্মম শাসনে পুত্রকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। পিতৃ হৃদয়ে তাহার জন্য যে এতটুকু স্নেহ বা মমতা সঞ্চিত রহিয়াছে চারু তাহার একটু আভাসও পাইল না। পিতাকে সে চিনিল শুধু শাসকরূপেই দণ্ডবিধানের কর্ত্তা স্বরূপে।

প্রতি কার্য্যে তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হওয়ায় চারুর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল—বিধিনিষেধের অসংখ্য গণ্ডীর মাঝে আবদ্ধ থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। সমস্তটা বাড়ী যেন একটা কারাগার! সেখানে শাসনের কঠোরতা আর পীড়নের নির্ম্মমতা ছাড়া আর কিছুই নেই। স্নেহ

মমতা, অনুকম্পা যা পারিবারিক জীবনকে একটা স্নিগ্ধ মাধুর্য্যে ভরাইয়া তুলে, চারু তাহার পরিচয় পাইল না। এমন কি তাহার জননী ও ভগ্নী পর্য্যন্ত প্রকাশ্যে তাহাকে আদর বা যত্ন করিতে সাহস পাইতেন না পাছে পিতা জানিতে পারিয়া অধিকতর ক্রুদ্ধ হন! পিতা যে অন্ন দেন, বস্ত্র দেন, শিক্ষা-ব্যয় বহন করেন, সেইটাই নাকি পুত্রের উপর যথেষ্ট অনুগ্রহ! অন্য কোন কারণে নয়, কেবল সেই জন্যই পুত্রকে গঞ্জনা সহিয়াও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে হইবে। পিতা পুত্রের সম্বন্ধটা এইরূপ বিকৃতভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করায় চারুর আত্মাভিমানে বিষম আঘাত লাগিল—এমন অনুগ্রহ হতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য সে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল।

এমনই সময় চারু একদিন বিনোদের একখানা চিঠি পাইল। বিনোদ লিখিয়াছে যে কেবল পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের সুখ বিধানের জন্য চারু দুনিয়ায় আসে নাই, পরের জন্যই তাহাতে সর্ব্বস্ব পণ করিতে হইবে। বিনোদ আরও লিখিয়াছে যে ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া—স্নেহের বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিয়া চারুকে এখনই দুনিয়ায় বাহির হইতে হইবে—মানবের দ্বারে দ্বারে তাহাকে মুক্তির গান গাহিয়া বেড়াইতে হইবে—আর তাহাতেই উদ্বুদ্ধ হইয়া অবসাদ-গ্রস্ত এই বিরাট জাতি আপন ইষ্ট সাধনের জন্য কর্ম্ম-পারাবারে ঝাঁপাইয়া পড়িবে।

বিনোদের চিঠি পড়িয়া চারু মুক্তির আনন্দ পান করিতে অধীর হইয়া উঠিল। সে ভাবিল কেন সে পড়িয়া থাকিবে ঘরের কোণে আপনাকে সকল রকমে ছোট করিয়া। সে সঙ্কল্প করিল, কাহাকেও কিছু না বলিয়া সে বিনোদের কাছেই চলিয়া যাইবে। নিরন্তর নিষ্ঠুর পীড়নে আপন জনের প্রতি তাহার যেটুকু স্নেহ-মমতা ছিল, তাহা একেবারে লোপ পাইয়াছে, তাহার উপর আবার মহৎ কিছু করিবার

প্রলোভন এবং আত্মত্যাগের আকাঙ্ক্ষা পিতা মাতা প্রভৃতির চিন্তা তাহার মন হইতে দূরে ঠেলিয়া রাখিল। কেবল তাহার সংশয় জন্মিল সতীশকে জানাইবে কিনা তাহারই বিচারে।

চারু একদিন সন্ধ্যার পর সংশয়-সঙ্কুচিত চিত্তে ধীরে ধীরে সতীশের বাড়ী গিয়া ভৃত্যদ্বারা সতীশকে সংবাদ পাঠাইল। গায়ত্রী তখন সতীশকে বুঝাইতেছিল যে বর্ত্তমান যুগে কৃষি ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করিতে হইলে কেবল ভারতবর্ষে প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করিলেই চলিবে না—পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক প্রণালী এবং যন্ত্রাদিরও সাহায্য লইতে হইবে। ভৃত্যের মুখে চারুর আগমনবার্ত্তা শুনিয়া আনন্দমোহন তাহাকে সেইখানে লইয়া আসিতে বলিলেন। ভৃত্য ফিরিয়া গিয়া চারুকে তাহাই জানাইল। চারু কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া হঠাৎ থামিয়া দাঁড়াইল এবং অন্য সময় আসিবে তাহাই জানাইতে বলিয়া ফিরিয়া চলিয়া গেল। চারু যে তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল, সতীশ সে কথা একেবারে ভুলিয়া গেল।

ইহার তিনদিন পরে সতীশ খামার হইতে ফিরিয়া আসিতেই পাড়ার একটি ছেলে সতীশকে জানাইল যে, চারুর খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না।

"বলিস কি রে?" বলিয়া সতীশ ছেলেটির দিকে বিস্মিত নয়নে চাহিয়া রহিল।

ছেলেটি উত্তর করিল—"হাঁ, সতীশদা, তিনদিন আগে সন্ধ্যার সময় চারু বাড়ী হতে বেরিয়ে যায়—তারপর একেবারে নিরুদ্দেশ।"

কথাটা সতীশ কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না সে জিজ্ঞাসা করিল—"আমায় আগে জানাস্‌নি কেন?"

"আমরাইত জানতুম না, সতীশ দা। দু'দিন তাকে স্কুলে না দেখে আমরা ভেবেছিলুম তার হয়ত অসুখ করেচে। তুমিত জানই তার

বাপের ভয়ে আমরা কেউ তার বাড়ী যাই না—আজ হঠাৎ শুনলুম সে নিরুদ্দেশ !”

সতীশ তাকে বিদায় দিয়া একেবারে পড়ার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল এবং বেশ পরিবর্ত্তন না করিয়াই একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া ভাবিতে লাগিল—চারু কাহাকেও কিছু না বলিয়া সহসা কোথায় চলিয়া গেল। চিরদিনইত চারু তাহার অন্তরের সকল গোপন কথা অকপটে তাহার নিকট প্রকাশ করিয়াছে। চিত্তে যখনই তাহার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তখনই সে তাহার নিকট ছুটিয়া আসিয়াছে। অথচ এতবড় একটা গুরুতর কাজ তাহার অগোচরে সে করিয়া ফেলিল।

সতীশের এখন মনে পড়িল যে তিনদিন পূর্ব্বেই ঠিক সন্ধ্যার সময়ইত চারু তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল। সেদিন যদি সে তাহার সহিত দেখা করিত, তাহা হইলে বিপথে ছুটিবার তাহার এই ঝোঁক নিশ্চিতই সে দমন করিতে পারিত।

ছেলে মানুষ বলিয়াই না চারুকে সেদিন সে উপেক্ষা করিয়াছিল ! নইলে গায়ত্রীর যাহা বক্তব্য, তাহার চাইতেই অধিকতর প্রয়োজনীয়, অপেক্ষাকৃত গুরুতর কিছু যে এই বালকের বলিবার থাকিতে পারে তাহা সে কেন ভাবিল না ? আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্বই যে, সেদিন তাহাকে চারুর কথা ভুলাইয়া রাখিয়াছিল, সে কথা বিশ্বাস করিয়া লইবার মত আত্ম-প্রবঞ্চনা করিতে সতীশ সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত।

এতদিন সে চলিয়াছে একটা ঝোঁকেরই উপর—একটা আনন্দেরই পুলকে। আজ সহসা নিজের অন্তরের গোপন-বাসনার পরিচয় পাইয়া সে ব্যথিত হইয়া পড়িল। গায়ত্রীর শিক্ষা ও কর্ম্মকৌশলে সে অনেক দিন পূর্ব্বেই মুগ্ধ হইয়াছিল—কিন্তু রূপের আকর্ষণ যে তাহার দেহটাকে টানিয়া লইতেছিল, তাহা এমন স্পষ্টভাবে সে কখনো

বুঝিতে পারে নাই।——কিন্তু কথাটা সত্য—অপ্রিয় হইলে সম্পূর্ণ নির্ভুল।

হায়! এই জন্যই কি সে প্রতি সন্ধ্যায় আনন্দমোহনের গৃহে ব্যাকুল আগ্রহে ছুটিয়া যায়?—জটীল প্রসঙ্গ সমূহের অবতারণা করিয়া এই জন্যই কি সে তাহার সান্ধ্য-সম্মিলন দীর্ঘকাল স্থায়ী করিবার প্রয়াস পায়?

সতীশ এমন করিয়া নিজেকে প্রশ্ন করিতে সাহস পাইল না। গত কয়েক মাস হইতে তাহার জীবনের যে পরিবর্ত্তন সুরু হইয়াছে, সে নিজেই তাহা বুঝিতে পারে নাই—কিন্তু তাহারই ফলে সে ছাত্র-সম্প্রদায় ও যুবকের দল হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে প্রতিদিন অপরাহ্ন-কালে ছেলেদের সঙ্গে মিলিয়া নানা রকম আলোচনা করিত—তাহাদের তরুণ হৃদয়ে অনাবিল-আনন্দে আপনাকে অভিসিক্ত করিয়া চিত্তের জড়তা বিদূরিত করিত। সেই নিয়মের ব্যতিক্রম না ঘটিলে চারু তাহাকে লুকাইয়া কিছুই করিতে পারিত না।

—কিন্তু ইহার জন্য দায়ী কে? গায়ত্রী কি? না—নিশ্চিতই নয়। গায়ত্রীর কথায় ও ব্যবহারে, ভাবে ও ভঙ্গীতে কোন দিন এমন কিছু প্রকাশ পায় নাই, যাহাতে তাহার চরিত্রে এই গুরুতর দোষ আরোপ করিয়া সে নিজের অপরাধ লঘু করিতে পারে। গায়ত্রীর চিত্তের কোন কোণে যে এতটুকু ছলনা অথবা প্রবঞ্চনা গোপন থাকিতে পারে, সতীশ তাহা বিশ্বাস করে না। নিজেও সে এতদিন বুঝিতে পারে নাই যে, গায়ত্রী তাহার এত কাছে আসিয়া এমনভাবে তাহার হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া পড়িয়াছে।

সতীশ একা বসিয়া মনে মনে এই সব আলোচনা করিতেছিল, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে, চারুর পিতা আসিয়াছেন। সতীশ

তাড়াতাড়ি করিয়া খামারের পোষাক পরিবর্ত্তন করিয়া বৈঠকখানায় গিয়া কহিল—"আমিই আপনার ওখানে যাব ভেবেছিলুম।"

মহিম মুখুজ্যে কহিলেন—"তুমি জান চারু কোথায়। তুমি—তুমিই তাকে লুকিয়ে রেখেচ।"

"না, খুড়োমশাই, আমি কিছুই জানিনে। চারু যে নিরুদ্দেশ আজ বিকালেই আমি তা প্রথম শুনলুম।"

মহিম চীৎকার করিয়া বলিলেন—"না, না, একথা মিথ্যা—সম্পূর্ণ মিথ্যা। তোমাদেরই ষড়যন্ত্রে আমি আমার একমাত্র পুত্রকে হারিয়েছি। সত্য বল—তাকে কোথায় রেখেছ। বল—নইলে আমি পুলিসে খবর দেব।"

"আপনি দুঃখে অধীর হয়ে পড়েছেন বলেই বুঝ্‌তে পারছেন না, কি আপনি বল্‌ছেন। আমার কথা বিশ্বাস করুন খুড়োমশাই। চারুর নিরুদ্দেশ, আপনাদের পরে আমার বুকেই বেশী আঘাত করেচে। আমি যদি তার গৃহত্যাগের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে জান্‌তে পারতুম, তা'হলে কিছুতেই সে আজ এমন করে বিপথে ছুটে যেতে পারতো না।" সতীশ কথাগুলি এমনভাবে বলিল যে মহিম বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি কিয়ৎকাল সতীশের মুখের দিকে চাহিয়া ভগ্নস্বরে কহিলেন—"তা'হলে কি হবে সতু—? আমি এই আশায় বুক বেঁধেছিলুম যে, তোমার কাছেই তার একটী খবর পাব। কিন্তু তুমি—তুমি যে আমার আশার আলো নিবিয়ে দিলে—আমার বুকের ছাতি ভেঙে ফেল্লে!"

সতীশ কিছু না বলিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

মহিম পুনরায় কহিলেন—"অভিমান করেই সে চলে গেল, সতু। একটীবার কি মনেও করলে না যে, তার অভাবে আমার সারাটা সংসার

শ্মশানের মত হয়ে উঠ্‌বে ? আমার ওপরেই তার রাগ—কিন্তু তার মা—তার বোন—বৃদ্ধ পিতামহী——তাদের ছেড়ে যেতেও কি তার এতটুকু কষ্ট হলো না ? বড় নির্ম্মম শাসনে আমি তাকে পীড়ন করেছি—কিন্তু হতভাগা কি বুঝ্‌তোনা যে, সে আমার জীবনের সর্ব্বস্ব—ইহ-কালের সহায়—পরকালের গতি ? আমি তাকে শাসন করেছি বলেই কি সেও আমার বুকে শেলের আঘাত করবে ?

কি বলা উচিত তাহা স্থির করিতে না পারিয়া সতীশ চুপ করিয়া রহিল।

মহিম আবার বলিলেন—"কত কষ্টই না সে পাচ্ছে বিদেশে ! যে বিষম অভিমান তার সতু, বাড়ীতেই কোনদিন সে কিছু চেয়ে খায়নি। আর আজ——আজ কার দ্বারে গিয়ে সে দাঁড়াবে দুমুঠো অন্নের প্রত্যাশায় ? কে তাকে ক্ষুধায় অন্ন দেবে, শীতে বস্ত্র দেবে, রোগে বুকে জড়িয়ে স্নেহ-হস্ত বুলিয়ে যাতনা প্রশমিত করবে ? সে যদি মরেও যেত, তা হলেও আমি এত কাতর হতুম না—কিন্তু বেঁচে থেকে যে এত কষ্ট পাবে, তাই ভেবেই আমি পাগল হয়েছি সতু। সে যে আমার কি করে গেছে, তা তোমায় বুঝান শক্ত। আমার চক্ষে নিদ্রা নেই—প্রাণে শান্তি নেই—বাড়ীতে পর্য্যন্ত থাক্‌বার উপায় নেই। তার মা—মুখে কিছু না বল্লেও—তুষের অগুনের মত ভিতরে ভিতরে পুড়ে মরছে——আর বৃদ্ধা পিতামহী তার, শয্যা গ্রহণ করে আমাকেই শুধু অভিশাপ করছেন।"

মহিম মুখুজ্জ্যে কাঁদিয়া ফেলিল। সতীশ নির্ব্বাক। কঠিন আবরণের অন্তরালে যে এতখানি কোমলতা থাকিতে পারে, তাহা আগে বুঝিতে না পারিয়া চারুর পিতার প্রতি সে কি অবিচারই না করিয়াছে ! চারুর পিতাকে এতদিন সে বড় নির্ম্মম বলিয়া জানিত, কিন্তু আজ সে বুঝিল

যে, স্নেহ ও মমতায় মহিম তাহার পিতা অথবা আনন্দমোহনেরই সমতুল। সে দেখিল, পিতারা সব একই উপাদানে গঠিত।

হায়! চারু যদি তাহার পিতার এই অগাধ স্নেহের এতটুকু পরিচয় পাইত—মহিম যদি স্নেহ-প্রকাশকে পিতৃ হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য মনে করিয়া অনাবশ্যকীয় কঠোরতা অবলম্বন না করিতেন, তাহা হইলে চারুর জীবনটা এমন করিয়া ব্যর্থ হইত না। কেবল বুঝিবার ভুলেই এমন একটা অনর্থপাত সম্ভব হইয়াছে।

সতীশকে নীরব দেখিয়া মহিম পুনরায় কহিলেন—"চারুকে তুমি এনে দাও সতু। এবার আর তাকে শাসন করব না। আমি তাকে স্নেহের সলিলে ডুবিয়ে রাখব—তার স্বেচ্ছাসম্পাদিত কাজে বাধা দেবার জন্য অভিভাবকের দণ্ড তুলে তার সাম্‌নে দাঁড়াব না! সে শুধু বেঁচে থাক—সুখে থাক্...আর মানুষ হোক্ এই আমার প্রার্থনা, সতু।"

মহিম মুখুজ্জ্যেকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়া সতীশ সঙ্গে গিয়া তাঁহার বাড়ী পৌঁছিয়া দিল এবং বাড়ী ফিরিবার পথে আনন্দমোহনের বাটী গিয়া উপস্থিত হইল। গায়ত্রী বৈঠকখানায় বসিয়া চাঁপাকে পড়া বলিয়া দিতেছিল। আনন্দমোহন বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। সতীশ প্রবেশ করিতেই গায়ত্রী জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার কি অসুখ করেছে সতীশবাবু?"

সতীশ উত্তর করিল—"না, তেমন কিছু হয়নি।"

চাঁপা কহিল—"তুমি লুকোচ্ছ, কাকাবাবু, মুখখানি তোমার শুকিয়ে গেছে।"

সতীশ গায়ত্রীকে বলিল—"শুনেছেন, চারু নিরুদ্দেশ?"

বিস্ময় প্রকাশ করিয়া গায়ত্রী কহিল—"বলেন কি! ছেলেমানুষ সে—একা চলে গেল?"

"আপনি আরও বিস্মিত হবেন একথা শুনে যে, তার এই গৃহ-ত্যাগের জন্য আমিই দায়ী।"

"আপনি—? না, না—সে আমি বিশ্বাস করতে পারিনে। তার পিতার শাসনই তাকে গৃহ হতে তাড়িয়েছে।"

"শাসনের কঠোরতাই তাকে ছুটিয়ে নিয়ে যেতে পারত না, যদি না মুক্তির একটা ভ্রান্ত ধারণা তার তরুণ হৃদয় নাচিয়ে তুলত। দেশের তরুণের দলকে আমি যেমন করে বুঝ্‌তে চেষ্টা করচি, অন্ততঃ এ গ্রামে আর কেউত করেনি! তাতেই আমি জেনেছি যে, এদের অন্তরে এম্‌নি একটা শক্তি জাগ্রত হয়েছে, যার বেগ রোধ করবার ক্ষমতা এদের নেই। কাজেই তারা শুধু ছুটে যেতে চায় অনিশ্চিতের পশ্চাতে। এই ছুটে যাওয়াকেই তারা সব চেয়ে প্রয়োজনীয় বলে মনে করে। আমার অপরাধ এই যে, আমি তাদের ভালমতে জেনেও তাদের একেবারে ছেড়ে দিয়েছিলুম। তাদের সঙ্গে সঙ্গে থেকে, তাদের কর্ম্ম-প্রবৃত্তিকে প্রবুদ্ধ রেখে, আমার কর্ত্তব্য ছিল তাদের বিপথে যাবার সম্ভাবনা নিবারণ করা। আমি তা করিনি। আমার সব চাইতে বড় দুঃখ এই যে, জীবনে এই প্রথম আমি কর্ত্তব্যচ্যুত হয়েছি—আর তারই ফলে চারুর মত এমন একটি অমূল্য রত্ন আমি কাদার মাঝে হারিয়ে ফেলেচি! মাসের পর মাস, প্রতি সন্ধ্যায়, ঘড়ীর কাঁটার মত সময়নিষ্ঠ আমি আপনাদের এখানে এসে হাজির হয়েছি—তাদেরই উপেক্ষা করে যাদের সহায়তা ব্যতীত পল্লীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর নয়। আমি তাদের দিকে ফিরেও চেয়ে দেখিনি——"

চাঁপা এক পেয়ালা চা আনিয়া সতীশের সম্মুখে রাখিল।

সতীশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"না রে চাঁপা, আজ আর চা খাবনা।" গায়ত্রী কোন কথা কহিল না। সতীশ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

গায়ত্রী জানিত মানুষ শোকে ও আত্মগ্লানির দারুণ মনস্তাপে দগ্ধ হইয়া চরিত্রের শিষ্টতা ও হৃদয়ের কোমলতা বর্জ্জন করিয়া অনেক সময় দুনিয়ার সমস্ত জিনিষের উপর চটিয়া যায়। কিন্তু, গায়ত্রী মনে করিল সতীশ কথাগুলি যেন অনাবশ্যকীয় জোরের সঙ্গেই বলিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে চারুর গৃহত্যাগের জন্য সতীশ যেমন দায়ী নয়, তেমনি সতীশের প্রতি সন্ধ্যায় এখানে আসিবার জন্য তাহারাও কিছুতেই দায়ী নহে—অথচ সতীশের কথার ভঙ্গীতে গায়ত্রী বুঝিল যে, সে তাহাদেরই নিজের কর্ত্তব্যচ্যুতির কারণ বলিয়া মনে করিতেছে। এই কথা মনে হইতেই গায়ত্রীর হৃদয় দুর্জ্জয় অভিমানে ভরিয়া গেল। সতীশের কার্য্যের সহায়তা করিতেই পিতাকে সম্মত করাইয়া সে গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছে—তাহাকে কর্ত্তব্য হতে দূরে টানিয়া লইবার অভিপ্রায়ে নহে।

এ কথা সত্য যে, সে সতীশকে চায়। নদী যেমন গতি চায়—বন্দী যেমন মুক্তি চায়—সৌরকরদগ্ধ মরুভূমি যেমন জল ও উর্ব্বরতা চায়, গায়ত্রী ঠিক তেমনই আগ্রহে সতীশকে আপন করিয়া লইতে চায়। সতীশের যে মূর্ত্তি সে এতদিন হৃদয়ে স্থাপন করিয়া গোপনে পূজা করিয়া আসিতেছে, তাহা কর্ত্তব্যপালনের অক্ষমতায় ম্লান, মহত্ত্বের অভাবে দীন এবং সংকীর্ণতার বেষ্টনে ছোট করিয়া সে দেখিতে চায় না। চায়না বলিয়াইত আপনার চঞ্চল-বাসনা সে চিত্তেই চাপিয়া রাখিয়াছে—নিশিদিন আগুনের জ্বালা বুকে লইয়া সে হাসিমুখে কর্ত্তব্যপালন করিয়াছে, সতীশকে ত কখনো কিছু জানিতে দেয় নাই! তবু সতীশ যে প্রতি সন্ধ্যায় তাহাদের বাড়ী আসিত, তাহার জন্য কি সে দায়ী?

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

রাত্রি তখন প্রায় বারোটা।

আনন্দমোহন শয়ন-কক্ষে বসিয়া একখানা বই পড়িতেছিলেন। গায়ত্রী নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। আনন্দমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখনও যে ঘুমাওনি, মা?"

"যে গরম পড়েছে বাবা। ঘরে আর টেঁকা যায় না।"

হাতের বইখানা টেবিলের উপর রাখিয়া বাহিরের জ্যোৎস্নাপ্লাবিত প্রকৃতির দিকে চাহিয়া আনন্দমোহন বলিলেন—"চল একটু বাহিরে গিয়ে বসি।"

"সেই ভাল। চল বাবা, ফুল-বাগানে যাই!"

উদ্যানে স্থাপিত দু'খানি আসনে পিতা ও পুত্রী পাশাপাশি বসিলেন।

বহুক্ষণ নীরবে থাকিয়া গায়ত্রী কহিল—"বাবা!"

"কি মা?"

"চল বাবা কলকাতায় ফিরে যাই।"

বিস্ময় প্রকাশ করিয়া আনন্দমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন মা··· কি হয়েচে?"

"কিছু হয় নি বাবা। এখানে যে কাজে এসেছিলুম, তা' এক রকম শেষ হয়ে গেছে। বয়ন-বিদ্যালয় সতীশবাবুর স্ত্রীর তত্ত্বাবধানে ভালরূপই চলতে পারবে। যারা বোনা শিখচে, তাদের তৈরী মোজা ও গেঞ্জী—তুমিত জানই বাবা—কলকাতায় বেশ কাটতি হচ্ছে। মেয়েদের ইস্কুল এবৎসর স্থাপিত হবার সম্ভাবনা খুবই কম। আমাদের

এখানে কোন কাজই নেই…আমরা শুধু সতীশবাবুর কাজের অসুবিধা করচি।"

"সতীশ আজ এসেছিল নাকি ?"

"হাঁ, বাবা। তিনি বড়ই দুঃখিত হয়েছেন চারুর গৃহত্যাগে। নিজের ওপরও বিরক্ত হয়েছেন কর্ত্তব্য পালনে অক্ষম হয়েছেন বলে, আর আমাদের জন্যই পারছেন না তিনি নিজের কর্ত্তব্য করতে।"

আনন্দমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন—"এমন কথা সে বল্লে কেমন করে ?"

"হয়ত, একথা সত্যি বাবা।"

"কি তুমি বলচ, আমি বুঝতে পারছিনে। আমরা তার কাজের অন্তরায় স্বরূপ দাঁড়িয়েছি !…সতীশ একথা বলেছে ?"

"না, না এমন কথা তিনি বলেন নি। তবে তার কথার ভাবে বুঝলুম, তিনি তাই-ই মনে করেন।"

"সতীশ কি তোমার অসম্মানকর কিছু বলেছে ?"

গায়ত্রী উত্তর করিল—"তুমিত জানই বাবা, সতীশবাবু সে ধরণের লোক ন'ন !"

"তবে সহসা কলকাতায় যেতে চাচ্ছ কেন ?"

গায়ত্রী এই প্রশ্নের কোনরূপ উত্তর দিতে পারিল না। আকাশের গায়ে তখন একখণ্ড মেঘ ভাসিয়া আসিয়া চাঁদের আলো নিষ্প্রভ করিয়া দিল। ম্লান চন্দ্রালোকে আনন্দমোহন দেখিলেন কন্যার মুখ ছাই'এর মত সাদা হইয়া গিয়াছে। তিনি বড়ই বেদনা অনুভব করিলেন। তিনি বলিলেন—"তোমার প্রতি আমি বড় অবিচার করেছি মা।"

"সে কি বাবা ?" বলিয়া গায়ত্রী পিতার মুখের দিকে চাহিল।

আনন্দমোহন বলিলেন—"হাঁ, মা। এমন সময় তোমায় এখানে—এই ভিন্ন সমাজের মাঝে—এনে আমি বড়ই অন্যায় করেছি।"

"না, বাবা। আমিত স্বেচ্ছায় এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই এখানে এসেচি। আর এসেচি বলে আমি একটুও অনুতপ্ত নই। যে আদর্শ নিয়ে আমি এখান থেকে যাচ্ছি, সমস্ত জীবনের সাধনা দিয়ে যদি তাকে সফল করতে পারি, তা'হলে নিজেকে ধন্য বলে মনে করব।"

"কি সে আদর্শ, মা?"

"আজ আমায় ক্ষমা কর বাবা, আর একদিন তা বলব।"

আনন্দমোহন আর কোনরূপ প্রশ্ন করিলেন না। তিনি বুঝিলেন কি যেন একটা দুশ্চিন্তা গায়ত্রীর চিত্ত মন্থন করিয়া তাহাকে ক্লিষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং ভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করিয়া তাহাকে দুশ্চিন্তার ঘনপাশ হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। রাত্রি প্রায় তিন প্রহর অতীত হইলে আনন্দমোহন বলিলেন—"চল, এখন শুতে যাই।"

গায়ত্রী পিতার অনুগমন করিল।

পরদিন প্রভাতে আনন্দমোহন তারানাথকে জানাইলেন যে, তাঁহারা দুই তিন দিনের মধ্যেই কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতেছেন। খামার হইতে ফিরিয়া আসিয়া আহারান্তে সতীশ যখন একটু বিশ্রাম করিতেছিল, তখন মনোরমা স্বামীর নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"দিদিরা নাকি চলে যাচ্ছেন?"

"কারা যাচ্ছেন?"

"গায়ত্রী দিদিরা?"

সতীশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"আমায় ত কিছু বলেন নি!"

"আজ সকালে আনন্দমোহন বাবু বাবাকে নাকি বলেছেন।"

সতীশ কহিল—"তা' হবে, বহুদিন কলকাতা ছাড়া—এখন যাওয়াই সম্ভব।"

"চাঁপাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চান।"

"বেশত, চাঁপা সুশিক্ষা ও সৎসঙ্গ পাবে।"

"তাঁরা চলে যাবেন, তা ভাবতেই আমার কষ্ট হচ্ছে। আর চাঁপাকে ছেড়ে আমি থাকৃতে পারব না। তার যে সংসারে আর কেউ নেই······! দিদির যখন বিয়ে হবে, তখন কোথায় সে থাকবে?"

"তখন তাকে আমরা নিয়ে আসব।"

এমন সহজভাবে স্বামীকে এই কথাগুলি বলিতে শুনিয়া মনোরমা বড়ই বিস্মিত হইল, কিন্তু কিছু না বলিয়া আপন কাজে চলিয়া গেল।

ছুঁচ-ফোটা ব্যথার মত একটা বেদনা অনুভব করিয়া সতীশ বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। গায়ত্রী হয়ত তাহারই উপর রাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে! কাল সন্ধ্যাকালে প্রাণের আবেগ চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া যাহা সে বলিয়া ফেলিয়াছিল, গায়ত্রী কি তাহাতেই অপরাধ লইয়াছে? কিন্তু, সে যাহা বলিয়াছিল, তাহাত কেবল নিজেরই কথা—নিজেরই অক্ষমতার স্বীকারোক্তি। সতীশের সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্মবিন্দু ফুটিয়া উঠিল। সে উঠিয়া জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

মনোরমা পুনরায় ঘরে ঢুকিয়া স্বামীর চেহারার পরিবর্ত্তন দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার অসুখ করেছে নাকি?"

"না মনু, কিছু হয়নি।"

"ইস্‌······ঘেমে যে একেবারে জল হয়ে গেছ দেখ্‌চি। তুমি বোস, আমি বাতাস করি।" স্বামীকে বিছানায় বসাইয়া মনোরমা তাহাকে ব্যজন করিতে লাগিল।

সহসা সতীশ ডাকিল—"মন্থু"

"কি হয়েচে, বলনা আমায় ?"

"তোমার ভালবাসার বর্ম্মে আমায় আবৃত করে রেখে দাও, মন্থু। সে আবরণ ভেদ করে, কোন রকম কলুষতা, এতটুকু হীনতা যেন আমার অন্তরে প্রবেশ করতে না পারে। নিবিড়তর বন্ধনে তুমি আমায় বেঁধে ফেল, যাতে করে আমার বিদ্রোহ-প্রবৃত্তি বিপথে ছুটে যাবার সুযোগ না পায়। আমি বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি, মন্থু।"

মনোরমা কোন কথা কহিল না। অজানা একটা অমঙ্গলের আশঙ্কায় সে অস্থির হইয়া উঠিল।

ঘড়িতে দুইটা বাজিতেই সতীশ উঠিয়া বেশ পরিবর্ত্তন সুরু করিয়া দিল। মনোরমা বলিল—"এই রোদের মাঝে আজ আর কাজে যেওনা······নিশ্চিতই তোমার অসুখ করেচে।"

"না মন্থু, ভয় নেই, কিছু হয়নি আমার।" বলিয়া সতীশ টুপিটা লইয়া বাহির হইয়া গেল। মনোরমা চাহিয়া দেখিল, স্বামীর সেই সহজ গতি আজ আর নাই—সে যেন তাহার দেহটাকে অতি কষ্টে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

খামারে গিয়া সতীশ কোন কাজ করিতে পারিল না। একটা গাছের নীচে বসিয়া গায়ত্রীর কথা ভাবিতে লাগিল। গায়ত্রী চিরদিন কিছু এই গ্রামে থাকিবে না, থাকিতে পারে না—একথা সে জানিত ও বুঝিত; তবুও আজ সে চলিয়া যাইবে শুনিয়া সে এত বিচলিত হইয়াছে কেন? গায়ত্রীর জীবনের কি খুব বড় একটা মূল্য নেই?

সতীশ ভাবিল, গায়ত্রীর উপস্থিতি তাহার নিকট প্রীতিকর বলিয়াই কি এরূপ আশা করা সঙ্গত যে, তার মত প্রতিভাময়ী এক নারী জীবনের সমস্ত সুখ-সম্পদ বর্জ্জন করিয়া চিরটা কাল পড়িয়া

থাকিবে পল্লীর এই নিভৃত প্রান্তে? না, না—সে তাহা চায় না। এমন হীনতা, এত স্বার্থপরতা কোন দিনই মুহূর্তের জন্যও তার হৃদয়ে স্থান পায় নাই! সে চায় গায়ত্রীকে দেখিতে মুক্ত আকাশের গায়ে গ্রথিত উজ্জ্বল তারকার মত। গায়ত্রীর শক্তি, সাধনা ও পরার্থপরতা একদিন তাহাকে যে বাংলার নারীকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিবে, সতীশ তাহা ভালরূপ জানিত। কিন্তু তবুও, গায়ত্রী চলিয়া যাইবে, অন্যের প্রভাবে সে ভিন্ন ধরণে গঠিত হইবে, তার হৃদয়ের সর্ব্বস্ব নিবেদন করিবে অপর কোন ব্যক্তির নিকটে—এই সব মনে করিতেই সতীশ বেদনায় কাতর হইয়া পড়িল! গায়ত্রীর নিকট যে সে কি প্রত্যাশা করে বার বার নিজেকে সেই প্রশ্ন করিয়াও সে কোন সদুত্তর পাইল না।

প্রায় সমস্তটা অপরাহ্ণ সতীশকে একটা গাছের তলায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া মধু এবং অন্যান্য কৃষকেরা একে একে তাহার পিছনে গিয়া দাঁড়াইল। তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া সতীশ জিজ্ঞাসা করিল—"কিরে, এত সকালে যে আজ কাজ ছেড়ে চল্লি?"

মধু কহিল—"আমরা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি, তুমি এমন ধারা চুপটি করে বসে রয়েছ কেন? কি তোমার হয়েছে, দাদাঠাকুর?"

সতীশ বলিল—"হবে আবার কিরে?"

পরাণ কহিল—"কিছু না হবে ত, মুখখানা তোমার অমন শুকিয়ে গেছে কেন?"

"তুমি যখন আস্‌ছিলে, তখন দূর থেকে তোমায় আমরা চিন্‌তেই পারিনি, দাদাঠাকুর! এমন বুড়োর মত কুঁজো হয়ে ধুক্‌তে ধুক্‌তে আসছিলে তুমি।" বলিয়া করিম মধুকে তাহার কথার সত্যতা প্রমাণ করিতে অনুরোধ করিল।

বিপিন কহিল—"আমি বুঝেছি মধু, মুখুজ্যে ঠাকুরদের সেই ছেলেটার জন্যই ভেবে ভেবে দাদাঠাকুর অমন হয়ে যাচ্ছে।"

সতীশ বলিল—"থাম্‌রে বিপিন, থাম্ বলচি।"

"তুমি এমন করলে আমরা তোমার পায়ের তলায় মাথা খুঁড়ে মরব, দাদাঠাকুর।" বলিয়া মধু অশ্রুপূর্ণ নয়নে সতীশের মুখের দিকে চাহিল।

করিম বলিল – "যদি কেউ অপমান করে থাকে, তাও বল—আমি তার শির এনে দেব।"

"তোরাই আমায় পাগল করে তুল্‌বি।" বলিয়া সতীশ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সকলকে কাজে যাইতে আদেশ করিল। তাহারা প্রস্থানোদ্যত হইলে, পরের দিন যে সব কাজ করিতে হইবে সংক্ষেপে তাহা বুঝাইয়া দিয়া সে বাড়ী ফিরিল এবং সন্ধ্যার পর নিয়মিত সময়ে আনন্দমোহনের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল।

পরদিন অপরাহ্ণে কলিকাতায় চলিয়া যাইবেন বলিয়া আনন্দমোহন সতীশের পিতাকে সঙ্গে করিয়া গ্রামের বন্ধুদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে বহির হইয়াছিলেন।

গায়ত্রী একটা কাঠের বাক্সের ভিতর কতগুলি বই গুছাইয়া রাখিতেছিল—চাঁপা আলমারী হইতে বই নামাইয়া দিতেছিল। সতীশকে দেখিতে পাইয়া চাঁপা বলিল—"কাকাবাবু এসেছেন!"

গায়ত্রী উঠিয়া দাঁড়াইয়া সতীশকে বসিতে বলিল। সতীশ একখানা চেয়ারে উপবেশন করিল, কিন্তু কোন কথা কহিল না।

গায়ত্রী কহিল—"কাল আমরা কলকাতায় যাচ্ছি, সতীশবাবু।— চাঁপাকেও সঙ্গে নিতে চাই।"

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল "কিরে চাঁপা, আমাদের ছেড়ে যাবি না কি ?"

"আবার ত ফিরে আসবই, কাকা বাবু।" বলিয়া চাঁপা সতীশের কাছে সরিয়া দাঁড়াইল।

সতীশ তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিল—"ভুলে যাবিনিত আমাদের?"

"তাই বুঝি ভোলা যায়!"

সতীশ গায়ত্রীকে বলিল—"বেশত! চাঁপাকে সঙ্গে নিয়ে যান। কিন্তু, আপনি হয়ত আমার উপর রাগ করেছেন?"

"রাগ করেচি—কেন?"

"কাল যা বলেছিলুম, তার জন্ম ক্ষমা করবেন।"

গায়ত্রী কহিল—"না, না—সে কিছু নয়, সতীশবাবু!"

সতীশ কি বলিবে তাহা বুঝিতে না পারিয়া একখানা বই তুলিয়া লইয়া তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিল।

গায়ত্রী বলিল—"বয়ন-বিদ্যালয়ের কাজ মন্টুই বেশ চালাতে পারবে। কলকাতায় গিয়ে আমি চেষ্টা করব যাতে, এখানকার তৈরী মোজা ও গেঞ্জির কাট্‌তি বাড়ে। মেয়েদের ইস্কুল-প্রতিষ্ঠা কিছুদিন স্থগিত রাখতে হবে। আমি একজন ভাল শিক্ষয়ত্রী পাঠাইবার চেষ্টা করব। অন্তঃপুরে শিক্ষাদানের জন্ম যাকে নিযুক্ত করা হবে, তার একটু বিশেষত্ব না থাকলে চলবে না।"

সতীশ চুপ করিয়া রহিল।

গায়ত্রী পুনরায় বলিল—"কবে যে আবার দেশে ফিরে আসব, তা কে জানে। কিন্তু কোন দিন যদি আমার উপস্থিতি আবশ্যক হয়, তা'হলে আমায় ভুলবেন না......পল্লীমায়ের সেবা করতে আমি সব সময়েই প্রস্তুত থাকব।"

সতীশ তথাপিও কিছু বলিতে পারিল না।

গায়ত্রী আবার বলিল—"আপনার নিঃস্বার্থ কর্ম্মকৌশলে আপনি যে একদিন আমাদের পল্লীকে আদর্শ গ্রামে পরিণত করতে পারবেন, তা আমি স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু চিরদিন আপনাকে ক্ষুদ্র এই গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখবেন না, সতীশ বাবু। আপনার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা একদিন যেন সমস্তটা দেশেরই কল্যাণে নিযুক্ত হয়, আর তার জন্য নারীর যতটা সম্ভব, ততটুকু সাহায্য আপনাকে করতে আমি চিরদিনই প্রস্তুত থাকব।" গায়ত্রী সতীশের উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া ক্রমাগতই বকিয়া যাইতেছিল। সারাদিন ধরিয়া আজ তাহার কেবলই মনে হইয়াছে সতীশকে বলিবার মত কত কথাই যেন তাহার অন্তরে জমিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এক্ষণে তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা খুঁজিয়া না পাইয়া যাহা মনে আসিতেছে তাহাই বলিয়া যাইতেছে।

গায়ত্রী স্থির করিয়াছে যে তাহার বুকের মাঝে যে বেদনা পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে কথায় বা কাজে, ভাবে বা ইঙ্গিতে কাহাকেও তাহার পরিচয় না দিয়া হাসিমুখে সকলই সহ্য করিবে। নীরবে যাতনা সহিবার মাঝেও যে একটু আরাম আছে—তাহা সে ভাল করিয়াই উপভোগ করিবে।

গায়ত্রী জিজ্ঞাসা করিল—"আপনাকে চা এনে দেব, সতীশ বাবু?"

সতীশের সম্মতি পাইয়া গায়ত্রী কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। সতীশ চাঁপার সাহায্যে বইগুলি সব বাক্সে ভরিয়া ফেলিল।

তারানাথকে সঙ্গে লইয়া আনন্দমোহন ঘরে ঢুকিলেন এবং সতীশকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন—"এই যে সতীশ!......কাল কিন্তু আমাদের ট্রেনে তুলে দিয়ে আসতে হবে।"

তারানাথ বলিলেন—"হাঁ, তা' যাবে বৈকি!"

আনন্দমোহনের কণ্ঠস্বর শুনিয়া গায়ত্রী দুই পেয়ালা চা আনিয়া টেবিলের উপর রাখিল।

চা পান করিয়া আনন্দমোহন তারানাথের সহিত গল্প করিতে লাগিলেন। সতীশ ভৃত্যকে লইয়া কতগুলি জিনিষ বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল। গায়ত্রী খুব কম কথাই বলিতেছিল কেবল মাঝে মাঝে করুণ দৃষ্টিপাতে সতীশকে দেখিয়া লইতেছিল। রাত্রি অধিক হইলে সতীশকে লইয়া তারানাথ প্রস্থান করিলেন।

আনন্দমোহন বলিলেন—"আজ সকাল সকাল শুয়ে থাক তোমরা!"

আহারান্তে গায়ত্রী শয়ন করিতে গেল, কিন্তু সারা রাত তাহার ঘুম হইল না। জানালার ফাঁক দিয়া ভোরের আলো তাহার চোখে পড়িতেই সে উঠিয়া বাহিরে গেল। কিন্তু সেদিনের প্রভাত-সমীরণ দিবসের আগমন ঘোষণা করিয়া তাহার চিত্ত আশায় ও আনন্দে নাচাইয়া তুলিল না—বিদায়ের করুণ রাগিণীতে তাহার বুকের মাঝে একটা অব্যক্ত বেদনার সঞ্চার করিল। সে পুনরায় শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

পিতার আদেশে সতীশ আনন্দমোহন এবং অন্যান্য সকলকে মধ্যাহ্নে তাহাদের বাড়ীতে আহারের নিমন্ত্রণ করিতে আসিল। আনন্দমোহন কহিল—"সেই ভাল সতীশ, খাবার আয়োজনে আর অনর্থক অসুবিধা ভোগ করিতে হবে না"

ভৃত্য ও পাচককে সকাল সকাল খাওয়াইয়া জিনিষ পত্র সঙ্গে দিয়া রেল ষ্টেশনে পাঠাইয়া দেওয়া হইল এবং মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই আনন্দমোহন কন্যা ও চাঁপাকে লইয়া সতীশদের বাড়ী গিয়া হাজির হইলেন। অন্তঃপুরে মনোরমা গায়ত্রীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল।

প্রাণ-প্রতিষ্ঠা

গায়ত্রী গিয়া পৌঁছিতেই সে তাহার হাত ধরিয়া আপন শয়ন-ঘরে লইয়া গেল এবং আবেগভরা কণ্ঠে কহিল—"সত্যই দিদি আমাদের ছেড়ে চল্লে ?"

"না গিয়ে কি করি ভাই !…বেঁচে থাকিত আবার দেখা হবে।"

"কলিকাতায় গিয়ে কি আমাদের কথা মনে থাকবে দিদি ?"

"তোদের ভুলে যাব ? তোরা যে আমার বুকের কতটা যায়গা অধিকার করে নিয়েছিস্ অন্তর্য্যামিই তা জানেন।"

"এত শীঘ্র চলে যাবে জান্লে কমলঠাকুরঝিকে রেখে দিতুম শুনে সে খুবই কষ্ট পাবে।"

গায়ত্রী কহিল—"জানিস্ মন্থু, এখানে আসবার আগে ইস্কুলে পড়েনি যে সব মেয়ে তাদের আমি অশিক্ষিতা মনে করতুম, কিন্তু কমলের সঙ্গে পরিচয় হয়ে আমার সে ভুল ভেঙে গেছে।"

মোক্ষদাময়ী আসিয়া বলিলেন—"ওদের শীগ্গীর করে এঁটোমুখ করিয়ে দেও বউ মা, নইলে একটু বিশ্রাম করেও যেতে পারবে না।"

দ্বিপ্রহরের পরেই বয়ন-বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা এবং পাড়ার বালিকা ও বধূগণ গায়ত্রীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে আসিল। তাহাদের সকলেরই চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত, হৃদয় বেদনায় ভরা। ভিন্ন সমাজের এই পাশ করা মেয়েটি প্রথম যখন নূতন ভাব লইয়া বিচিত্র বেশে তাহাদের মাঝে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তখন বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করিতে তাহারা বিরত হয় নাই—কিন্তু ক্রমে তাহার হৃদয়ের স্নেহ-ভালবাসার পরিচয় পাইয়া, শোকে সান্ত্বনা—দুঃখে সহানুভূতি এবং বিপদে তাহার অযাচিত সাহায্য লাভ করিয়া তাহারা পরম আত্মীয় জ্ঞানে তাহাকে বরণ করিয়া লইয়াছিল। আজ বিদায়ের দিনে তাহাদের প্রত্যেকেই তাই গায়ত্রী কাছে সমবেত হইয়াছে।

গায়ত্রী একে একে স্নেহ-সম্ভাষণে সকলকে তুষ্ট করিয়া সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

যতক্ষণ দেখা যায়, মনোরমা এবং অন্যান্য সকলে গায়ত্রীর দিকে চাহিয়া রহিলেন—তারপর সে দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেলে বিজয়া দশমীর দিনে প্রতিমা বিসর্জ্জনে পাঠাইবার বেদনা বুকে লইয়া তাহারা ধীরে ধীরে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

রেল-ষ্টেশনে পৌঁছিতে একটু দেরী হওয়ায় তাড়াহুড়া করিয়া তাহাদের ট্রেনে চাপিতে হইল। সতীশ জিনিষগুলি যথাস্থানে উঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। গায়ত্রী এক কোণে আনন্দমোহনের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়াছিল—তাহার চক্ষু হইতে যখন অশ্রুর আবরণ অপসৃত হইল তখন সে চাহিয়া দেখিল দিগন্ত বিস্তৃত ধান্যক্ষেত্রের বুক চিরিয়া ট্রেন দ্রুত ছুটিয়াছে।

বিংশ পরিচ্ছেদ

গায়ত্রী চলিয়া যাইবার কদিন পরে বাছের সর্দ্দার আসিয়া সতীশকে জানাইল যে, পরবর্ত্তী সোমবার গোবর্দ্ধন জেলখানা হইতে মুক্তি পাইবে। সতীশ কহিল—"আর তিন দিন বাকি ?"

"হাঁ, বাবু! আমি আজই গিয়ে আম্মার মালতী মাকে খবর দিয়ে আসি।"

"সোমবার সকালে কিন্তু জেলখানার দুয়ারে হাজির থাক্‌তে হবে।"

করজোড়ে বাছের কহিল—"আমায় মাপ করবেন বাবু, একা আমি যেতে পারব না।"

"সে কি বাছের, তুমি না এই এক বছর ধরে রোজই তার মুক্তির দিন গণে আস্‌ছিলে ?"

"আল্লার দোহাই বাবু, আমাকে রেহাই দিন। আমায় দেখেই যখন সে তার গোপালের কথা জিজ্ঞাসা করবে, তখন আমি কি জবাব দেব ? কিছুই ত সে জানে না !"

সতীশ কিছুকাল চিন্তা করিয়া বলিল—"আমিই তোমার সঙ্গে যাব বাছের। যেমন করে যা বল্‌তে হবে, আমিই তা বলব। তুমি শুধু তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবে।"

বাছের সম্মতি জানাইল। সতীশ কহিল—"বেশ তা'হলে আজই গিয়ে তুমি গোবর্দ্ধনের স্ত্রীকে তার মুক্তির খবর দিয়ে এস।"

"খোদা আপনাকে সুখে রাখুন।" বলিয়া বাছের বিদায় লইল।

সতীশ বসিয়া ভাবিতে লাগিল, অল্প কয়েক দিনের ভিতর কত কাজই তাহাকে করিতে হইবে। চারুর অনুসন্ধান আর গোবর্দ্ধনের

জীবিকার্জ্জনের ব্যবস্থা বিলম্ব সহিবে না। তারপর হেমেন্দ্রলালও তাহাকে বার বার করিয়া তাহাদের ওখানে যাইতে অনুরোধ করিতেছে। গায়ত্রীর কলিকাতায় যাইবার গোলযোগে গত কয়টা দিন সে চারুর কথা একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছিল। অথচ সে চারুর পিতাকে আশা দিয়াছে যে তাঁহার পুত্রের সন্ধান সে করিয়া দিবে! গায়ত্রী চলিয়া যাইবার জন্য সে হৃদয়ের মাঝে যে বিরাট শূন্যতা উপলব্ধি করিতেছিল, কর্ম্মের প্রচেষ্টায় তার সবটুকু সে ভরিয়া ফেলিবে।

সতীশ সেই দিনই হেমেন্দ্রলালের সঙ্গে দেখা করিতে যাত্রা করিল এবং সন্ধ্যার কিছু পরেই তাহার বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। হেমেন্দ্র সতীশকে পাইয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিল—"আমি ভেবেছিলুম, আপনি হয়ত আসবেন না।"

"কেন আসব না, হেম? এত করে লিখেচ তোমরা?"

"অনেক দিন থেকে ভাবচি, আপনাদের ওখানে গিয়ে একবার আপনার ক্ষেত খামারগুলি দেখে আসব।"

"বেশ ত! এবার আমার সঙ্গেই চল না?"

"তাই যাব। আর আপনার আদর্শ নিয়ে আমিও কাজে প্রবৃত্ত হব।"

"সত্যি বলচ, হেম?"

"হাঁ, দাদা, সত্যি বলচি।"

বহু চেষ্টা করিয়া আজ হেমেন্দ্র সতীশকে দাদা বলিয়া ডাকিয়াছে।

সতীশকে ভাল করিয়া জানিবার পর হইতেই তাকে আরো আপন করিয়া লইবার জন্য হেমেন্দ্র তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে, কিন্তু এতদিন সঙ্কোচের ভাবটা ঘুচাইতে পারে নাই।

দাদা বলিয়াই আজ সে সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিল যে, সে সতীশের গুণ-মুগ্ধ—তাহারই প্রীতি-প্রার্থী।

হেমেন্দ্রলালের এই সরলতার পরিচয় পাইয়া সতীশ বেশ একটু আরাম অনুভব করিল এবং সাগ্রহে তাহার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বলতে পার হেম, আজ আমি কেন এসেছি ?"

হেমেন্দ্র কোনো কথা না বলিয়া প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে সতীশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"আমি এসেছি" সতীশ বলিতে লাগিল—"গোবর্দ্ধনের একটা ব্যবস্থা করতে। সে জেল হতে ফিরে আস্‌চে, শুনেছ বোধ হয় ?"

বিস্ময় প্রকাশ করিয়া হেমেন্দ্র কহিল—"গোবর্দ্ধন !...আপনি তাকে জানেন ? আমি বড়ই—"

তাহাকে শেষ করিতে না দিয়া সতীশ কহিল—"আমি সবই জানি হেম, বাছের সর্দ্দার আমায় বলেছে।"

হেমেন্দ্র কহিল—"আমি তার প্রতি বড়ই অবিচার করেছি।" তাহার স্বর অনুতাপ-ব্যঞ্জক।

সতীশ বলিল—"যা হয়ে গেছে, তার জন্য আর দুঃখ করে লাভ নেই, হেম। বেচারার বাকীটা জীবন যাতে নষ্ট না হয়, তার উপায় কর।"

"বলুন, আমায় কি করতে হবে ?"

"গোবর্দ্ধনের কথা আমি অনেক ভেবেচি। আর আমি শুনেছি খুবই ভাল লোক সে। কেবল দারিদ্র্যের পীড়নে আর মানুষের অবিচারে সে ক্ষেপে গিয়েছিল। তার কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে তারই মত অবস্থাপন্ন বংলার লক্ষ লক্ষ যে সব লোকের জীবন একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, তাদের কথাও আমার মনে পড়চে। এই গোবর্দ্ধন এবং

তারই মত লোকেরা সামান্য লেখাপড়া শিখেই আমাদের অনুকরণে অসম্ভব রকমে চাকুরী-প্রিয় হয়ে উঠেছে। এরা যদি ইংরাজী হরফে তাদের নামটুকু লিখ্‌তে নাও শিখ্‌ত, তা হলেও তাদের কোনই ক্ষতি হোত না, অথচ তারা হাল ধরতে অথবা ঐ ধরণের কোন কাজ করতে নিশ্চিতই লজ্জা বোধ করত না। অনেকেই সুখে থাকৃতে পারত, আট দশ টাকা বেতনের বিনিময়ে দাসত্বের চুক্তিতে আবদ্ধ না থেকে।”

হেমেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—“আপনি কি তা'হলে লোক-শিক্ষার বিরোধী।”

“...ঠিক তার বিপরীত। তাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে মার্জ্জিত করতে, তাদের কর্ম্মশক্তিকে ঠিকভাবে নিয়োজিত করতে, তারা যে মানুষ, সেই কথাটাই তাদের ভাল করে বুঝিয়ে দিতে—তাদের শিক্ষ দান করতেই হবে। কিন্তু দৃষ্টি রাখতে হবে, যাতে তারাও আমাদেরই মত কেবল চাকরী-মরীচিকার পেছনে ঘুরে না মরে। আমরা যেমন চলেছি, তেমনই চলব—একথা আমি বলতে চাইনে। আমাদের গতিও অন্য দিকে ফিরিয়ে নিতে হবে, আর এরাও যাতে আমাদের মত ঠেকে না শেখে, তারও উপায় দেখতে হবে।”

হেমেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—“এদের আপনি কি রকম শিক্ষা দিতে চান?”

“লেখাপড়া শেখাবার সঙ্গে সঙ্গে এদের আমি এমন সব শিল্পকাজে নিপুণ করে তুলতে চাই, যাতে তারা সম্মানের সঙ্গে তাদের জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে।”

“কি করে তা হবে?”

“এই গোবর্দ্ধনকে দিয়েই আমি সেই শিক্ষার গোড়াপত্তন করতে

চাই। আমি জানি জেলাখানার কয়েদীদের নানারকম শিল্প কাজ শেখান হয়। আমি শুনেছি সে সব বেশ ভাল রকম শিখেছে। আমি একটা স্কুল স্থাপন করিতে চাই। সেখানে গোবর্দ্ধন যা শিখে এসেছে, ছাত্রদের তাই শেখাবে। কামার, কুমার, জোলা, চামার, সব শ্রেণীর ছেলেরাই সেখানে শিখিবে, কেমন করে স্বল্পব্যয়ে অল্প পরিশ্রমে, প্রচলিত জিনিষের চাইতে ভাল জিনিষ তৈরী করা করা যায়। একা গোবর্দ্ধনকে দিয়ে এসব কাজ হবে না। ক্রমে দক্ষ শিল্পিদের নিযুক্ত করতে হবে। সোজা ভাষায় বই লিখিয়ে, তাই ছেলেদের পাঠ করাতে হবে এবং সম্ভবপর হলে শিক্ষিত যুবকদের বিদেশে পাঠিয়ে উচ্চ ধরণের শিল্প শিখিয়ে এনে এই স্কুলের শিক্ষাদান কার্য্যে নিয়োগ করতে হবে।"

হেমেন্দ্র বলিল—"তা যেন হোল, কিন্তু আপনার এই স্কুল হতে শিল্প শিক্ষা করে যারা বের হবে, তারা ব্যবসা চালাবার মত মূলধন কোথায় পাবে ?"

"এই তোমার মত জমিদার—যাদের অর্থ আছে, উৎসাহ আছে—তারাই যোগাবে। আর শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমবায়-শক্তির উপর দেশের লোকের বিশ্বাস স্থাপিত হবে—দেশের সর্ব্বত্রই শিল্প সমবায় প্রতিষ্ঠিত হবে।"

হেমেন্দ্র বিস্মিত হইয়া সতীশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সতীশ কহিল—"এসব কিছু আমার অলস মস্তিষ্কের অলীক কল্পনা নয়। আমি বেশ বুঝ্‌তে পারচি সেদিন আসবে—নিশ্চয়—এ নিশ্চয়।"

হেমেন্দ্র বলিল—"পিতৃ সঞ্চিত বহু অর্থ আমি অপব্যয়ে উড়িয়ে দিয়েছি। অনেক পাপ করেছি এ জীবনে! আমায় পথ দেখিয়ে দিন, ভাল হবার একটা সুযোগ দিয়ে অপনার এই অপদার্থ ভাইটীকে মানুষ

কমলা দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইয়া ছিল। স্বামীর শেষ কথাগুলি শুনিয়া সে দ্রুতপদে ঠাকুর-ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল এবং বস্ত্রাঞ্চল গলায় জড়াইয়া উপুড় হইয়া গোপীনাথকে প্রণাম করিল। এতদিনে সে নিশ্চিন্ত হইল। স্বামী যখন তাহার দাদার কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তখন আর কিসের শঙ্কা ?

আহারের সময় হেমেন্দ্র ও সতীশের কথাবার্ত্তা শুনিয়া কাত্যায়ণী বুঝিলেন যে, তাহাদের মাঝে যে অপ্রীতির বরফ জমিয়া উঠিয়াছিল স্নেহের উত্তাপে তাহা গলিয়া ভাসিয়া গিয়াছে,আপন আরাধ্য দেবতাকে স্মরণ করিয়া তিনিও উহাদের মঙ্গল কামনা করিলেন।

দুইদিন পরে সতীশ যখন বাড়ী ফিরিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল, তখন কেহই সম্মতি দান করিল না। কমলা ত কাঁদিয়াই ফেলিল। হেমেন্দ্র কহিল—"আরও দু'টো দিন দেখে যান, দাদা। তারপর আমিও আপনার সঙ্গে যাব।" বিবাহের পর হেমেন্দ্র কখনও শ্বশুরালয়ে আর যায় নাই।

সতীশ কহিল—"চল হেম, আজই আমরা যাই। কাল সকালে আমাকে সহরে যেতেই হবে। কাল যে গোবর্দ্ধনের কারামুক্তির দিন।

"তা হলে আমার আর যাওয়া হোলনা, দাদা।"

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল—"কেন ?"

হেমেন্দ্র কোনরূপ উত্তর না দিয়া নীরব রহিল।

সতীশ কহিল—"ওঃ বুঝেছি। তুমি জমিদার, কারামুক্ত প্রজার সঙ্গে দেখা করতে সহরে যাবে—তাতে তোমার আভিজাত্যের মর্য্যাদা নষ্ট হবে—কেমন, তাই নয় ?"

হেমেন্দ্র তবুও কোন কথা কহিল না।

সতীশ পুনরায় বলিল—"এ মিথ্যা অহঙ্কার তোমায় ত্যাগ করতে

হবে, হেম। গোবর্দ্ধনের প্রতি যে অবিচার তুমি করেছ, বিনা দোষে তুমি তাকে যে কঠোর শাস্তি দিয়েছ—তার জন্য সরলভাবে তার কাছে মার্জ্জনা চাইলে তোমার সম্মান বাড়বে বই কমবে না। মানুষেরই ত সে কাজ!"

হেমেন্দ্র কহিল—"কিন্তু সে আমায় ঠিক কি ভাবে গ্রহণ করবে, তাত আমি জানি না।"

"তোমার ভয় হচ্ছে, পাছে সে তোমায় অপমান করে? কিন্তু তা সে করবে না, আমি তাদের ভাল মতেই জানি, হেম।"

অবশেষে হেমেন্দ্র যাইতে সম্মত হইল।

নির্দ্দিষ্ট দিবসে সতীশ হেমেন্দ্র ও বাছের সর্দ্দারকে সঙ্গে লইয়া সহরে গিয়া উপস্থিত হইল এবং যথাসময়ে জেলখানার ফটকের সম্মুখে গোবর্দ্ধনের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। এক এক করিয়া মুক্তির আদেশ প্রাপ্ত কয়েদীরা দ্বারের নিকটে আসিয়া সমবেত হইল। বহুদিন পরে তাহারা আজ স্বজন সমীপে ফিরিয়া যাইবে—বহুকাল যাবৎ নিরন্তর লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতনের ফলে তাহাদের অন্তরে যে বেদনা কঠিন হইয়া জমিয়া উঠিয়াছে, প্রিয়জনের স্নেহ-সলিলে তাহা গলিয়া মিলাইয়া যাইবে। অনর্থক অপেক্ষা করিবার ধৈর্য্য হারাইয়া ব্যাকুল আগ্রহে তাহারা চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে লৌহদ্বার মুক্ত হইল। উল্লাসধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত করিয়া বহুদিন পরে তাহারা মুক্ত আলো বায়ুর মাঝে স্বাধীনভাবে আসিয়া দাঁড়াইল।

বাছের সর্দ্দারকে দেখিতে পাইয়া গোবর্দ্ধন ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। আবেগভরে তাহার সারাটা দেহ কাঁপিয়া শিহরিয়া উঠিতেছিল। সতীশ ও হেমেন্দ্র একটু দূরে দাঁড়াইয়াছিল। বাছের তাহাদের আসিবার কারণ বুঝাইয়া বলিয়া সতীশের দয়া-মায়া সম্বন্ধে

অনেক কথাই তাহাকে জানাইল। সমস্ত শুনিয়া গোবর্দ্ধনের ইচ্ছা হইতেছিল যে, সে সতীশের পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়ে—কিন্তু অত্যাচারপরায়ণ দাম্ভিক তাহার ভূস্বমীকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া সে লৌহদণ্ডের মত অটল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সতীশ গোবর্দ্ধনের এই ভাবপরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া হেমেন্দ্রকে লইয়া তাহার সম্মুখে গিয়া কহিল—"গোবর্দ্ধন, হেম যা করচে, তার জন্য সে অনুতপ্ত—তাকে ক্ষমা কর।"

হেমেন্দ্র কহিল—"আমায় ক্ষমা কর, গোবরা দা।"

গোবর্দ্ধনের চক্ষু ছাপাইয়া জল বাহির হইল। সে উভয়ের পদধূলি মাথায় লইল।

কাছে একখানা ঘোড়ার গাড়ি অপেক্ষা করিতেছিল। তাহারা সকলে গিয়া তাহাতে উঠিল এবং এক ঘণ্টার মধ্যেই হেমেন্দ্রলালের বাড়ীতে গিয়া পৌছিল।

কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া আহারাদির পর গোবর্দ্ধন বাছের সর্দ্দারের সঙ্গে ভবিষ্যতের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল, এমন সময় সতীশ তাহাদের উভয়কে ডাকিয়া পাঠাইল। তাহারা তখনই সতীশের নিকট হাজির হইল। সতীশ তাহাদিগকে বসিতে বলিল এবং গোবর্দ্ধন ভবিষ্যৎ জীবন কিরূপে অতিবাহিত করিবে তাহা জানিতে চাহিল। প্রত্যুত্তরে গোবর্দ্ধন কহিল যে সে কিছুই স্থির করিতে পারে নাই।

সতীশ বলিল—"তোমার জন্য আমি একটা চাকরী ঠিক করে রেখেচি। তুমি যদি তা গ্রহণ করিতে রাজি হও, তা হলে সুখে ও শান্তিতে থাকিতে পারবে।"

গোবর্দ্ধন উত্তর করিল—"আপনার অশেষ দয়া। বলুন, কি আমায় করতে হবে। আমি প্রাণপণে আপনার কাজ করব।"

"সে কথা আর একদিন হবে। আজ তোমাকে এখনই তোমার শ্বশুর বাড়ী যেতে হবে। গোপাল বড় অসুস্থ।"

গোবর্দ্ধনের মুখখানি একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল। বাছের সর্দ্দারের দিকে ফিরিয়া সে কহিল—"এতক্ষণ কেন বলনি সর্দ্দার?" তাহার অধর ও ওষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল। সে সতীশকে জিজ্ঞাসা করিল—"বেঁচে আছে ত বাবু?...গিয়েত দেখতে পাব।" সতীশ কোন কথা না বলিয়া মাথা নীচু করিল। গোবর্দ্ধন একবার সকলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"কথা কইছেন না যে!" সকলেই নীরব।

"ওঃ বুঝেছি। সে নেই...! সর্দ্দার আমার গোপাল নেই?" বলিয়া গোবর্দ্ধন আর্ত্তস্বরে চেঁচাইয়া উঠিল—তারপর বাছেরকে জড়াইয়া ধরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। সতীশ অথবা হেমেন্দ্র কেহই কোন কথা বলিতে পারিল না।

কাত্যায়নী গোবর্দ্ধনের আর্ত্তনাদ শুনিয়া সেইখানেই উপস্থিত হইলেন এবং দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, হতভাগ্যকে তাহার পুত্রের মৃত্যু সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। তিনি ধীরে ধীরে গোবর্দ্ধনের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। বাছের নিজেকে মুক্ত করিয়া সরিয়া গেল। কাত্যায়নী গোবর্দ্ধনের মস্তক কোলে টানিয়া লইয়া তাহার পিঠে স্নেহ হস্ত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

শোকের প্রথম বেগ কতকটা প্রশমিত হইলে গোবর্দ্ধন উঠিয়া বসিল এবং সতীশকে বলিল—"গরীবের ঘরে কেন সে এসেছিল বাবু?—কেবল দুঃখ পেয়েই চলে গেল......ক্ষিধের সময় খেতে দিতে পারিনি, রোগেও পথ্য দিতে পারিনি, আমি যাবার আগের দিনও জ্বর ছেড়ে গেলে যখন সে খেতে চেয়েছিল, তখন তার মুখে শুধু জল দিয়েছিলাম। তবু যদি আমায় ছিনিয়ে নিয়ে এমন করে জেলে না পুরত, তা হলেও

তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারতাম। কি অপরাধ আমি করেছিলাম বাবু?······আর আমার মনিব, যিনি আমার বাস্তুভিটা গ্রাস করেছেন, বিনা অপরাধে আমায় জেলে পাঠিয়ে আমার স্ত্রী পুত্রকে আশ্রয় বিহীন করেছেন—আর যার জন্য আমার গোপাল পরের গৃহে থাকতে না পেরে অভিমান ভরে চলে গেল······তিনি—উপরে যদি ভগবান থাকেন—তিনি······"

"গোবরা গোবরা, একটুখানি থাম্। যদি অভিশাপই করবি, তবে আমার কথাটা আগে শুনে নে।" বলিয়া কাত্যায়নী গোবর্দ্ধনের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। গোবর্দ্ধন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল!

কাত্যায়নী পুনরায় বলিলেন—"পুত্র শোক যে কি ভয়ানক, তুই আজ তা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝতে পেরেছিস্। তাই বুঝে পারিস যদি তুই মায়ের বুকে আঘাত করতে, তবে কর আমার পুত্রকে অভিশাপ। কিন্তু তাতে কি তোর বুকের ব্যথা ঘুচ্‌বে?"

গোবর্দ্ধন কোন কথা না বলিয়া মাথা নীচু করিয়া কিছুকাল বসিয়া রহিল—তারপর কাত্যায়নীর পদ ধারণ করিয়া কহিল—"মা, ক্ষমা করুন আমায়।"

সতীশ আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। উঠিয়া গোবর্দ্ধনকে বুকে টানিয়া লইল। গোবর্দ্ধন কহিল—"বাবু, এইটেই আমার দোষ। বড় সহজে রেগে উঠে আমি একেবারে ক্ষেপে যাই।"

হেমেন্দ্র এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল যে, গোবর্দ্ধনের ছেলের মৃত্যুর জন্য সেইত দায়ী। কাত্যায়নী তাহাকে বলিলেন—"গোবর্দ্ধনের কাছে ক্ষমা চাও, হেম। তাকে তুমি বড় ব্যথা দিয়েছ।"

হেমেন্দ্র উঠিয়া গোবর্দ্ধনের কাছে যাইতেই সে কহিল—"আপনাদের

কাছে আর আমায় অপরাধী করবেন না। আমার আর কোন দুঃখ নেই। গোপালকে হারিয়ে আমি আমার মনিবকে ফিরে পেয়েছি।” তারপর সতীশের দিকে ফিরিয়া কহিল—“আপনি জানেন না বাবু, এতদিন কি দুঃখেই আমরা দিন কাটিয়েছি। কর্ত্তার আমলে যে অগাধ স্নেহের অধিকারী ছিলাম—খোকা বাবু তা থেকে আমাদের বঞ্চিত করেছিলেন, আজ তা ফিরে পেয়েছি।”

সতীশ কমলার কাছে গিয়া তাহাকে সকল কথা জানাইল। সে কহিল—“দাদা, সত্যই তুমি যাদুকর।”

সতীশ উত্তর করিল—“না রে, এ কাজ আমাকে দিয়ে হয়নি। মায়ের স্নেহ শোকের আগুন নিবিয়ে দিয়েছে। এমনই মায়ের শক্তি!”

একবিংশ পরিচ্ছেদ

দুই বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে।

অক্লান্ত পরিশ্রম ও অদম্য অধ্যবসায় সহকারে সতীশ তাহার পল্লীর অনেক অভাবই দূর করিয়াছে। তাহারই চেষ্টায় কৃষককুল বুঝিয়াছে যে সকলের পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িয়া থাকিবার জন্তই তাহারা ছুনিয়ায় আসে নাই, মানুষের সব অধিকার তাহারাও ভোগ করিবে, তাঁহাদের জন্ম সমাজের বিশিষ্ট একটা যায়গা যে রহিয়াছে, সে কথা কাহাকেও অগ্রাহ্য করিতে দিবে না। নিজেদের এমনি করিয়া যখনই তাহারা চিনিতে পারিল, তখন হইতেই তাহারা নিজেরাই চেষ্টা করিল সকল রকমে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে। তাহারা যত বেশী স্বাবলম্বী হইতে লাগিল, সতীশও সকল অনুষ্ঠান হইতে ততই হাত গুটাইয়া লইয়া তাহাদের কর্ম্মকৌশল বৃদ্ধির সহায়তা করিল।

ভদ্রঘরের শিক্ষিত যুবক সত্যসত্যই যেদিন লাঙ্গল হাতে ক্ষেতে নামিয়াছিল, সে দিন অনেকেই বলিয়াছিল, একটা ঝলক রৌদ্রে পুড়িয়া, আধটা পশলা জলে ভিজিয়াই সতীশ এই সখের ব্যবসা ছাড়িয়া চাকরী গ্রহণ করিবে। কিন্তু দুটো বছর যখন ঘুরিয়া গেল, অথচ সতীশকে কেহ এতটুকুও সঙ্কল্পচ্যুত হইতে দেখিল না, তখন সন্ধান লইয়া তাহারা জানিল যে কৃষক সম্প্রদায়ের মাঝে সতীশ এক নূতন জীবন সঞ্চার করিয়াছে। হলধর খুড়ো আর তাঁহারই মত দুচারজন, ছোট লোক কৃষকদের অতিবৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া মাঝে মাঝে থানার দারোগা বাবুর কাজে গিয়া শান্তি-ভঙ্গের আশঙ্কা জানাইয়া আসিতেন।

কাজ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সতীশ মনে করিয়াছিল যে, কার্য্যে

সাফল্য লাভ করিতে পারিলেই, তাহারই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া শিক্ষিত অনেক যুবকই চাকরীর মোহ কাটাইয়া পল্লীতে ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু কোথাও তেমন কোন চেষ্টার পরিচয় না পাইয়া সতীশ একটা বেদনা অনুভব করিল। কিন্তু হতাশ হইয়া হাত পা ছাড়িয়া বসিয়া পড়িবার ছেলে সতীশ নয়। সে সঙ্কল্প করিল পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে তাহার ভাব প্রচার করিয়া সেই সব গ্রামের লোকদের এই নূতন জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করিবে আর তাহার সেই কাজে ভদ্র-সন্তানদের সহায়তা না পাইলেও এখন তাহার কিছু আসিয়া যায় না, কেন না, মধু কৈবর্ত্ত, গোপাল পরামাণিক প্রভৃতি মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, সতীশ সত্যিকার সাহায্য তাহাদেরই নিকট পাইবে।

এই সঙ্কল্প কাজে পরিণত করিবার জন্য সতীশ পাশের একটা গ্রামে ঘন ঘন যাতায়াত করিতে লাগিল।

এমনই সময় একদিন টেলিগ্রামের পিয়ন আসিয়া তাহাকে একখানা জরুরি টেলিগ্রাম দিয়া গেল। সতীশ কম্পিত হস্তে খামখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া টেলিগ্রাম পড়িল। তাহার মুখখানি সহসা ছাইয়ের মত শাদা হইয়া গেল আর পলকবিহীন নেত্রে সে চাহিয়া রহিল হাতের সেই লাল কাগজখানারই দিকে।

প্রায় দশমিনিট কাল স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া সতীশ ধীরে ধীরে পিতার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। মনোরমা রামায়ণ পড়িতেছিল, তারানাথ আর সতীশের জননী বসিয়া তাহাই শুনিতেছিলেন টেলিগ্রাম হাতে সতীশকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়াই তারানাথ জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ও কার তার সতু ?"

মনোরমা অবগুণ্ঠন টানিয়া সরিয়া বসিল। সতীশ কোন কথা না বলিয়া কাগজখানি পিতার হাতে দিল। তারানাথ বার দুই তাহা

পড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সতীশকে বাহিরে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এর মানে কি সতু ?"

"আমি ত কিছুই বুঝতে পারচি নে, বাবা। কালও কমলের চিঠি পেয়েচি—তাতে কারু কোন অসুখের কথা তো সে লেখেনি। হেমেন্দ্রও তো বেশ সংযত ভাবে শান্ত হয়ে তার ইস্কুলের কাজ করচে।"

কিছুকাল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া তারানাথ কহিলেন—"হেমেন্দ্র ওখানে উপস্থিত থাকতে তার মা কেন এ টেলিগ্রাম করলেন, তা তো আমি কিছুতেই বুঝতে পারচিনে, সতু! আর কি বিপদ হয়েচে, তা না জানিয়ে কেবল 'অবিলম্বে চলে এস' বলেই বা তার করলেন কেন ?"

"আমিও ত কিছুই বুঝতে পারচি না, বাবা!"

সতীশ সেই দিন অপরাহ্নেই মহেশপুর রওনা হইয়া গেল। হেমেন্দ্রলালের বাড়ী পৌঁছিতেই বৃদ্ধ দেওয়ান তাহাকে লইয়া নিজের ঘরে বসাইলেন। সতীশ তাহাতে আরও বিচলিত হইয়া পড়িল, সাহস করিয়া কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

দেওয়ানজী কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া কহিলেন—"ব্যস্ত হবেন না, সতীশ বাবু। আমরা সকলেই শারীরিক ভালো আছি।"

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল—"হেম কোথায় ?"

"সেও শারীরিক ভালোই আছে, কিন্তু—"

"কিন্তু ?...বলুন দেওয়ানজী, কিন্তু কি ?"

"সে লজ্জার কথা, ঘৃণার কথা আপনাকে আমি কেমন করে বলি সতীশবাবু ? আপনি ভেবেছিলেন, আমরাও আশা করেছিলুম যে সে আর ও পথে যাবে না—আপনার সংস্পর্শে এসে সকল রকম বদ-খেয়াল হতে চিরকালের তরে সে মুক্তিলাভ করেচে, সদ্যস্থাপিত সদ-

ষ্ঠানগুলি ভালো করে গড়ে তুলতে সে তার সবখানি মনদিয়েই চেষ্টা করচে। কিন্তু ভুল, আমরা সবাই ভুল করেছিলুম সতীশবাবু। সে যেমন ছিল ঠিক তেমনই আছে, তার স্বভাবের এতটুকুও পরিবর্ত্তন হয় নি—আজও সে চরিত্রহীন, লম্পট !"

সতীশ প্রতিমুহূর্ত্তেই মনে করিতেছিল দেওয়ানজীর এই উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া সে আসল কথাটা জানিয়া লইবে, কিন্তু কিছুতেই তাহা পারিয়া উঠিল না অজানা এই দুঃসংবাদের আঘাতের ভয়ে।

দেওয়ানজী আবার সুরু করিলেন—"আপনি হয়ত আমার কথা শুনে অসন্তুষ্ট হচ্ছেন, সতীশবাবু, ভাবচেন আমি তার কর্ম্মচারী হয়ে তার সম্বন্ধে এমন সব অসম্মানজনক কথা বলচি! কিন্তু আমি যে তাকে কেবল বেতন-দাতা মনিব বলে কখনো ভাবতে পারিনে, তার জন্ম অবধি নিঃসন্তান আমি আমার সবখানি স্নেহ যে তাকেই বিলিয়ে দিয়েচি!"

সতীশ কহিল—"তা কি আমি জানিনে দেওয়ানজী ? হেমের জন্য আপনি যা করচেন, হেম না বুঝলেও আমি তা বুঝি। কিন্তু হেম কোথায় ? কি সে করেচে ?"

দেওয়ানজী খুব খানিকটা চেষ্টা করিয়া সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন, তাপর বলিলেন—"সে কোথায়, তা আমরা কেউ জানিনে। শুধু এইটুকু খবর পেয়েচি তার ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে নতুন একটা মেয়ে-লোক লইয়া সে কোথায় উধাও হইয়াছে!"

কথাটা বাজের মত সতীশকে আঘাত করিল। সে একটিও কথা কহিল না। একটুও নড়িল না, পলকবিহীন নেত্রে ছাতের কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া রহিল। এমনি ভাবেই পনরো মিনিট কাটিয়া গেল।

দেওয়ানজী ধীরে ধীরে উঠিয়া সতীশের পিছনে গিয়া দাঁড়াইলেন

এবং সস্নেহে তাহার হাত দু'খানি ধরিয়া কহিলেন—"আপনি একবার বাড়ীর ভিতরে চলুন, সতীশবাবু! আপনি সান্ত্বনা না দিলে ওঁদের সামলানো যাবেনা!"

"না দেওয়ানজী, সে আমি পারব না। আমার ওই একটি মাত্র বোন দেওয়ানজী, বাড়ীর বড় আদরের মেয়ে। আঘাতের পর আঘাত সয়ে সয়ে ওর যে দুরবস্থা হয়েচে, তা দেখবার মত নির্ম্মমতা আমার নেই আর হতভাগ্য সন্তানের অভাগী জননী ছেলে বড় হওয়া অবধি যে দাগা পেয়ে আসচেন দুটো মুখের কথায় কি তার বেদনা ঘৃণা বা লজ্জা দূর করা যায়? কি হবে দেওয়ানজী এদের সঙ্গে দেখা করে, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে?"

বহুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া দেওয়ানজী কহিলেন—"কিন্তু আপনার ভগ্নী যে সংজ্ঞাহারার মত পড়ে রয়েচেন, দু'দিনের মাঝে জল বিন্দুও স্পর্শ করেন নি।"

সতীশ কথাগুলি কাণ পাতিয়া শুনিল, কিন্তু তাহার গুরুত্ব যেন বুঝিতে পারিল না। সে কহিল—"কত বড় আঘাত সে পেয়েচে, তা কি আপনি বোঝেন না, দেওয়ানজী? ক্রমাগত তার নারীত্বের, পত্নীত্বের যে হীন অবমাননা হেয় করেচে, তা সয়েও কমল কেমন করে বেঁচে আছে আমি তাই-ই ভাবচি। এবার হয়ত সে আর বাঁচবে না!"

"তাই ত বলচি, সতীশ বাবু। চলুন একবার বাড়ীর ভিতরে। মা-লক্ষ্মীকে সুস্থ করে তুলুন, তারপর কিছু দিন ওঁকে নিয়ে আপনাদের ওখানে রাখুন। ভগবানের কৃপায় আবার সুদিন আসবে।"

"আর সুদিন এসেচে, দেওয়ানজী!" বলিয়া সতীশ টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল। দেওয়ানজীও কোন কথা বলিতে পারিলেন না।

সহসা মাথা তুলিয়া সতীশ কহিল—"জানেন দেওয়ানজী, অভাগী আমার এই বোন,মনের ব্যথা আর সইতে না পেরে যখন আমায় কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করত—'দাদা, কি হবে ?' তখন আমি তাকে সুদিনের অপেক্ষা করতে বলতুম—কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, লাঞ্ছনা আর অত্যাচার ততই নির্ম্মম আঘাতের চিহ্ন তার বুকে দেগে দিচ্ছে। সুদিনের আশা তাকে আর কেমন করে দেখাব দেওয়ানজী ?"

দেওয়ানজীর সঙ্গে কথাবার্ত্তার ফলে সতীশ অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইল তারপর দেওয়ানজীর সঙ্গে ধীরে ধীরে অন্দরে প্রবেশ করিল। বাড়ীর ভিতর ঢুকিতেই সতীশের বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। অমঙ্গলসূচক কি দারুণ নিস্তব্ধতা ! দাসী চাকরের সাড়া নাই, প্রতিপালিত আত্মীয়-কুটুম্বের কোলাহল নাই, এত বড় বাড়ীটার মাঝে একটিও যে জীবিত প্রাণী আছে তাহার এতটুকু পরিচয় নাই।

দেওয়ানজীর পিছনে পিছনে একটির পর একটি ঘর অতিক্রম করিয়া সতীশ অগ্রসর হইতে লাগিল আর তাহার দেহটাও যেন একটু একটু করিয়া ভারি হইয়া উঠিল। শেষটায় হেমেন্দ্রের মায়ের ঘরের সামনে উপস্থিত হইতেই দেহটাকে পাথরের বোঝার মতই সে দুর্ব্বহ বলিয়া মনে করিল, পদমাত্র অগ্রসর হইবার শক্তি হারাইয়া সে দরজার সামনেই দাঁড়াইয়া রহিল।

হেমেন্দ্রের জননী সতীশকে দেখিয়াই কাঁদিয়া কহিলেন—"এসেছ বাবা !"

সতীশ প্রচণ্ড চেষ্টায় শক্তি সংগ্রহ করিয়া ঘরে ঢুকিয়া মেজের উপরই বসিয়া পড়িল।

হেমেন্দ্রলালের মা কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন—"আমি পেটে ধরেচি আমাকে সবইত সইতে হবে। সয়ে সয়ে বুকটা এমন

কঠিন হয়ে গেছে যে নতুন কোন রকম আঘাত আমায় আর ব্যথা দিতে পারবে না। কিন্তু আমার বড় সাধের বড় সোহাগের কমল, আমার ঘরের লক্ষ্মী, সোণার প্রতিমাখানি যে ধুলোয় লুটিয়ে পড়েচে। তার কাছে যাও বাবা, তোমার বোনকে দেখ।"

সতীশ উঠিল। নিঃশব্দে, অতি ধীরে ধীরে ভগ্নির ঘরের সামনে গিয়া দাঁড়াইল। কমলা পা ঝুলাইয়া খাটের উপর বসিয়াছিল, যেন শ্বেতপাথরের একটি মূর্ত্তি!

সতীশ বাহিরেই দাঁড়াইয়া রহিল, ঘরে ঢুকিতে পারিল না। সতীশের পিছনে দাঁড়াইয়া দেওয়ানজী উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—"মা লক্ষ্মী! তোমার দাদা এসেছেন।"

কমলার দেহ এতটুকু নড়িল না, মুখের কোন রকম ভাবের ব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইল না—শুধু যেন দেহটা পড়িয়া রহিয়াছে, প্রাণ কোথায় কোন দূরে ছুটিয়া গিয়াছে।—সতীশ নিজেকে আর সামলাইতে পারিল না—"কমল, আমি এসেচি" বলিয়াই ছুটিয়া গিয়া ভগ্নির মাথাটা এক হাতে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

প্রবল স্পন্দনে কমলার সারাটা দেহ কাঁপিয়া উঠিল আর সেই স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গেই দেহে যেন প্রাণ ফিরিয়া আসিল, দাদার কোলে মাথা রাখিয়া কমলা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

পরদিন সতীশ কহিল—"কমল চল্ আমরা বাড়ী যাই, এ বাড়ীতে আর তোকে থাকতে হবে না।"

কমলা সজল-চোখে দাদার মুখের দিকেই চাহিয়া রহিল, কোন কথা বলিল না।

সতীশ আবার কহিল—"তোর এই অপমান, এমন লাঞ্ছনা আমি আর সইতে পারিনে।"

প্রাণ-প্রতিষ্ঠা

"তুমি না সইতে পার, কিন্তু আমাকে ত সইতেই হবে

"কেন, কিসের জন্য কমল ?"

"এই জন্যই সইতে হবে যে, এ অপমান আমার স্বামীর দান।"

"কিন্তু যে স্বামী, স্ত্রীর প্রতি এমনি দুর্ব্যবহার করে তার দানও কি স্ত্রীকে মাথা পেতেই নিতে হবে ?"

"স্ত্রী যদি তাই নিতে চায়, তা হলে তাকে তা থেকে নিরস্ত রাখবার চেষ্টা কি সঙ্গত ?"

সতীশ উত্তেজিত হইয়া কহিল—"তোর কাছে এ কথা আমি প্রত্যাশা করিনি, কমল ! যে স্বামী স্ত্রীর নারীত্বের পত্নীত্বের মর্য্যাদা রাখতে জানে না, কোন স্ত্রীরই উচিত নয় তার স্বামীত্ব মেনে নেওয়া।"

ম্লান হাসি হাসিয়া কমলা কহিল—"উচিত না হলেও অনেক স্ত্রীই তা মেনে নেয়, কেননা এ ব্যাপারে মগজের বিচারই সব চেয়ে বড় নয়, হৃদয় বলেও স্ত্রীদের একটা জিনিষ আছে আর সে জিনিষ যুক্তি তর্কের খুবই কম ধার ধারে।"

সতীশ কোন কথা কহিল না।

কমলা আবার বলিল—"একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারিনে, দাদা। নারী যদি মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় একটা খারাপ কাজ করে ফেলে, তা হলে সে তোমার সহানুভূতির পাত্রী হতে পারে আর আমার স্বামীও দুর্ব্বলতার বশে খারাপ কাজ করেছেন বলে আমি নারীত্বের গরবে ফুলে তাকে ঠেলে ফেলে কেন দেব ? আমি জানি নিজেকে শোধরাবার কি চেষ্টা তিনি এতদিন করেছেন, তিনি দুর্ব্বলতা জয় করবার শক্তি অর্জ্জন করতে পারচেন না বলে আমার দুঃখ হয়, কিন্তু তোমায় আমি সত্যি বলচি দাদা, তাঁর প্রতি আমার

এতটুকুও ঘৃণা কখনো হয় না। তা যদি হতো, তা হলে আমি তোমার সঙ্গেই বাড়ী চলে যেতুম।”

সতীশ এ কথার কোন জবাব দিতে না পারিয়া মাথা নত করিয়া বসিয়া রহিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রায় এক সপ্তাহ অপেক্ষা করিয়াও সতীশ কমলাকে তাহার সঙ্গে বাড়ী ফিরিতে রাজী করাইতে পারিল না। অগত্যা সতীশ একাই ফিরিয়া আসিল। কিন্তু বাড়ী টেঁকাও তার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। খামারের কাজ কর্ম্মের একটা ব্যবস্থা করিয়া সে কিছুদিনের জন্য দেশ ভ্রমণে বাহির হইল।

কলিকাতায় পৌঁছিয়া সতীশ একেবার গায়ত্রীর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আনন্দমোহনের বাড়ী গেল। দুটি অপরিচিত ভদ্রলোক বাইরের ঘরে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। সতীশ তাঁহাদিগকে জানাইল যে, সে একবার আনন্দমোহনের সঙ্গে দেখা করিতে চায়।

একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি তাঁর আত্মীয় ?

"হ্যাঁ, এক গাঁয়েই আমাদের বাড়ী।"

"তবুও আপনি জানেন না ?"

সতীশ কিছু বুঝিতে না পারিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অপর ভদ্রলোকটি কহিলেন—"তিন চার মাস পূর্ব্বে তাঁর কাল হয়েচে।"

এই অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদে সতীশ বড়ই মর্ম্মাহত হইল। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—"তাঁর ছেলে মেয়েদের খবর কিছু বলতে পারেন ?"

"কিছু পারি বৈ কি। ছেলেটি একটি চাকরী নিয়ে লাহোর গেছে আর মা নেই বলেই হয়ত মেয়েটিও কিছু অদ্ভুত ধরণের হয়ে

গেছে। সে দমদমায় একটা বাগানবাড়ী ভাড়া নিয়ে যত-লক্ষ্মীছাড়া মেয়েদের নিয়ে একটা ইস্কুল খুলেচে। বাপের সঞ্চিত প্রায় লাখ খানেক টাকা আর এই বাড়ী বিক্রয় করে যা পেয়েচে, তার সবটাই হয়ত এই বাজে খেয়ালেই সে উড়িয়ে দেবে!"

সতীশ এ কথায় কোন জবাব না দিয়া গায়ত্রীর ঠিকানা লইয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

রাস্তায় যাইতে যাইতে সতীশ ভাবিল, কি আকস্মিক একটা দুর্ঘটনা সমস্ত পরিবারটিকে একেবারে ওলটপালট করিয়া দিয়াছে। সুধীর লাহোরে গিয়াছে, গায়ত্রী একাকিনী এতবড় একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার গ্রহণ করিয়াছে, সর্বোপরি আনন্দমোহন ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। অথচ গায়ত্রী তাহাকে কিছুই জানান প্রয়োজন বোধ করে নাই!

অপরাহ্নে সতীশ দমদমায় গিয়া গায়ত্রীর ইস্কুল খুঁজিয়া বাহির করিল। উচ্চপ্রাচীর বেষ্টিত প্রকাণ্ড একটা বাগান বাড়ী। প্রবেশ দ্বারের দুই পার্শ্বে ছোট ছোট ঘরে মালী, বেয়ারা ও দ্বারবানদের থাকিবার স্থান। সতীশ এক টুকরা কাগজে নিজের নাম লিখিয়া বেয়ারাকে দিয়া গায়ত্রীর নিকট পাঠাইয়া দিল।

ভিতরে ইস্কুলের মেয়েরা খেলা করিতেছিল, গায়ত্রী দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতেছিল। বেয়ারার হাতের কাগজখানা লইয়া গায়ত্রী পড়িয়া দেখিল। তাহার সারাটা মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে চাঁপাকে ডাকিয়া বলিল—"সতীশ বাবু এসেছেন চাঁপা। তুই তাঁকে নিয়ে আয়, আমি বসবার ঘরে চল্লুম।" দ্বিতলে বসিবার ঘরে গিয়া গায়ত্রী দেওয়ালে ঝুলান একখানা ফটোর নীচে স্থাপিত একটা ব্রাকেটের উপর হইতে কতগুলি ফুল লইয়া অন্যত্র রাখিয়া দিল, তারপর কম্পিত বক্ষে সতীশের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

বেয়ারা ফিরিয়া গিয়া সতীশকে সেলাম জানাইল। সতীশ ভিতরে ঢুকিতেই চাঁপা তাহাকে প্রণাম করিয়া পদধুলি লইল। সতীশ তাহার মাথায় হাত রাখিয়া কহিল—"তুই দেখচি মস্ত বড় হয়ে গেছিস, চাঁপা। ভাল আছিস্ ত?"

চাঁপা মনোরমা এবং তাহার পরিচিত সকলের কুশল প্রশ্ন করিল। সতীশ যাইতে যাইতে তাহার উত্তর দিতে লাগিল।

একটা পুষ্করিণীর সম্মুখে খানিকটা খোলা যায়গা ছিল। গায়ত্রীর ছাত্রীরা সেইখানে খেলা করিতেছিল। সতীশ তাহাদের হাসিমাখা মুখ এবং স্বাস্থ্যপূর্ণ অবয়ব দেখিয়া প্রীত হইল। সকলেই বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কাছেই কয়েকটি মেয়ে ফুলের গাছে জল দিতেছিল। সতীশকে দেখিয়া তাহারা দূরে সরিয়া গেল। চাঁপা তাহাদের এক জনার নাম ধরিয়া ডাকিয়া কহিল—"লজ্জা হল বুঝি? তাহারা হাসিয়া পুনরায় কাজে যোগ দিল।

চাঁপা একটা সজ্জিবাগ দেখাইয়া বলিল "দেখুন আমরা নিজেরা কেমন সুন্দর বাগান করেচি, খুব বড় বড় বেগুন আর কপি হয়েছে।"

সতীশ বলিল—"বাঃ! চমৎকার হয়েচে ত রে!"

চাঁপা অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে কহিল—"আর ঐ হচ্ছে আমাদের গো-শালা?"

"গরুর পরিচর্য্যাও তোরা করিস্?"

"হাঁ, কাকা বাবু! গয়লাও রয়েচে দুজন, কিন্তু বেশী কাজ আমরাই করি।"

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে তাহারা একটি দ্বিতল

উপস্থিত হইল। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া চাঁপা কহিল—

ঘর, আর আমরা থাকি উপরে। চলুন আগে সেখানে

তাহার উপরে উঠিতেই গায়ত্রী সতীশকে নমস্কার করিয়া বসিবার ঘরে লইয়া গেল। তুইবৎসর পরে দেখা—প্রথমে কেহ কোন কথা বলিতে পারিল না। চাঁপা সতীশের কাছে একখানা চেয়ার টানিয়া দিল। সতীশ বসিয়া গায়ত্রীকে কহিল—"আপনাদের বিপদের কথা আমরা কিছুই জানতুম না।"

প্রাচীর গাত্রে আনন্দমোহনের একখানি ফটো ছিল। সজল নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া গায়ত্রী বলিল—"হঠাৎ চলে গেলেন! তুদিন আগেও কিছু বুঝিনি। ছেলেবেলায় মাকে হারিয়াছি, কিন্তু বাবার স্নেহে সে অভাব কোনদিনই বুঝ্‌তে পারিনি। জীবনে এমন স্নেহ আর পাব না।"

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল—"স্থধীর লাহোরে গেল কেন?"

"লাহোরের এই চাকরীটা বেশ। হাজার টাকা মাসে পাচ্ছে—ভবিষ্যতে উন্নতিরও আশা আছে। তবুও সে এখানেই থাকৃতে চেয়েছিল—আমিই নিষেধ করলুম। আমাকেও সঙ্গে নিতে চেয়েছিল, কিন্তু অমি এই ইস্কুল স্থাপন করব স্থির করেছিলুম।"

"ভারি স্থন্দর হয়েছে, আপনার এই ইস্কুলটি।"

"বন্ধুরা কেউ আমার এই কাজ সমর্থন করেননি। চারিদিক হ'তে যতই বাধা পেলুম, ততই ইস্কুলটাকে ভাল করতে আমার বেশি আগ্রহ হলো। এইসব কাজের চাপেই আর আপনাকে চিঠি লিখে উঠ্‌তে পারিনি। কিন্তু, আমি জান্তুম যে, আপনার সহাম্নভূতি নিশ্চয়ই পাব।"

"আসবার সময় আপনার ছাত্রীদের খেলা করতে দেখলুম। বাঙালীর মেয়েরা যে এমন সপ্রতিভ ও সজীব হতে পারে, সে ধারণা আমার ছিল না।"

গায়ত্রী বলিল—"অথচ এদেরই জীবন দারিদ্র্যের পীড়নে আর

মানুষের তাচ্ছিল্যে একদিন পাথরের মত দুর্ব্বহ হয়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে অন্ততঃ এমন দশটি মেয়ে আছে, যাদের সংসারে আপন বলতে কেউ নেই, যারা ছেঁড়া কাপড় পরে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত, ক্ষুধার জ্বালা সইতে না পেরে—দুঃখের কথা কি বলব আপনাকে—নিমন্ত্রণ বাড়ীর এঁটো পাতের পরিত্যক্ত খাদ্য কুকুরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে খেত! আমি নিজে তা দেখেচি।" বলিতে বলিতে গায়ত্রী কাঁদিয়া ফেলিল। সতীশেরও চক্ষু জলে ভরিরা গেল।

নিজেকে সামলাইয়া লইয়া গায়ত্রী কহিল—"বাবা যা রেখে গেছেন,তার শেষ কড়া পর্য্যন্ত ব্যয় করে, আমার মাঝে যা ভাল আছে, তার সবটুকু শেষ করেও যদি এদের অভিশপ্ত জীবনকে সফল ও সার্থক করে তুলতে পারি, তা হলে নিজেকে ভাগ্যবতী বলে মনে করবো। আমি জানি এদের জন্য আমায় অনেক কিছু সইতে হবে। এরা যদি আচারে ও ব্যবহারে, শিক্ষায় ও কর্ম্মকৌশলে, ত্যাগে ও সেবায় উন্নত সম্প্রদায়ের মেয়েদের চাইতে অধিকতর উন্নতও হয়, তবুও বাংলাদেশে এদের স্থান করে নেওয়া সহজ হবে না—সমাজ এদের দূরে ঠেলে রাখবেই। এসব জেনেও আমি এদের ভার নিয়েচি এই আশায় যে, একদিন হয়ত এরা সুখের সন্ধান পাবে।"

"আপনার আশা যে ফলবতী হবে, তা আমি ঠিক বলতে পারি। আমাদের সকলের অগোচরে নবীন বাঙালীর অন্তরে ফল্গুধারার মত যে ভাবের প্রবাহ বয়ে চলছে, তা যখন গোপন থাকতে না পেরে শতধারায় ছুটে বের হবে, তখন পাথরের বাঁধও ভেঙে ভেসে যাবে। তখনকার সমাজ আপনার এই ছাত্রীদের আদরে বুকে টেনে নেবে। এই স্কুল স্থাপন করে আপনি দেশের যে উপকার করেছেন, তার মূল্য বুঝতে পেরে বাঙালী আপনার নিকট চির-কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে।"

গায়ত্রী কহিল—"কিন্তু জানেন না আপনি যে, এই কাজের প্রেরণা প্রথম আমি পেয়েছি আপনারই কাছে? আপনারই প্রদর্শিত পথ ধরে চলেছি আমি।"

বিস্ময় প্রকাশ করিয়া সতীশ কহিল—"সেকি! আমিত আপনাকে কথনো বলিনি।"

"বলেননি সত্য। কিন্তু চাঁপাকে আমার হাতে সঁপে দিয়ে আপনি যেন আমায় নতুন পথ দেখিয়ে দিয়েছেন বলে আমি মনে করি। চাঁপার অতীত জীবনের করুণ কাহিণী শুনে আর আপনার শিক্ষা পেয়ে সে যা হয়েচে, তাই দেখে—বেদনায় ক্লিষ্ট, তাচ্ছিল্যে সঙ্কুচিত, এমন কত চাঁপাই যে রয়েচে, সেই কথাই আমার প্রথম মনে হল, আর সেইদিনই আমি ঠিক করলুম যে এমনি একটা স্কুল করব।"

গায়ত্রীর ছাত্রীরা খেলা শেষ করিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল এবং চাঁপার ইঙ্গিতে একে একে ঘরে ঢুকিয়া সতীশকে প্রণাম করিল। সতীশ প্রত্যেকটি মেয়ের মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। সকলের শেষে সাত আট বছরের একটী মেয়ে সতীশকে প্রণাম করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল।

সতীশ তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার নামটি কি বলত?"

সে উত্তর করিল—"কনক্।"

"বাঃ, বেশ নামটি ত?"

কনক হাসিয়া কহিল—"আমার আগের নাম হারাণী। দিদি এই নতুন নাম দিয়াছেন। বাবা যথন আমায় হারাণী বলে ডাকত, তথন আমার বড্ড রাগ হোত—কি ছাই একটা নাম!"

গায়ত্রী সতীশকে বলিল যে, কনক খুব ছোট থাকিতেই

তার মায়ের মৃত্যু হয়, এবং এক মাতাল বাপ ছাড়া সংসারে তার কেহ নাই।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল—"বাবার জন্য তোমার দুঃখ করে না কনক ?"

"না, বাবা যে মারত !"

"কেন ?"

"আমায় হাবুর মা'র কাছে রেখে বাবা রোজ রোজ কোথায় চলে যেত। আমি রেতে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়তুম। বাবা ফিরে এলে হাবু আমায় জাগিয়ে বাবার কাছে শুতে যেতে বলত। আমি যেতে চাইতুম না বলে বাবা মারত, খুব মারত।"

"তুমি যেতে চাইতে না কেন ?"

"বাবা চোখ দুটো লাল করে কি সব বকত—একদিন রেগে আমার গায়ে বমি করে দিয়েছিল—হাঁ, সত্যি। আমার তাই বাবার কাছে যেতে ভয় করত।"

মেয়েটিকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া সতীশ বলিল—"আমায় তুমি চেন ?"

"চিনি না ? তুমি হচ্ছ গুরুদেব।" বালিকা অতি সহজভাবে কথাগুলি বলিয়া ফেলিল।

গায়ত্রীর দিকে চাহিয়া সতীশ জিজ্ঞাসা করিল—"সে কি !"

গায়ত্রীর মুখ লাল হইয়া গেল। সে কোন কথা বলিতে পারিল না।

কনক একবার সতীশের দিকে আর একবার প্রাচীর গাত্রে লম্বিত একখানা ফটোর দিকে চাহিয়া মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতেছিল।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল—"হাস্‌চ কেন ?"

"ওই যে ঐ ছবি, ওখানা কার ?"

"ওত আমারই ফটো।"

"দিদি বলেছেন, উনিই তাঁর আর আমাদের গুরুদেব। দিদি রোজ সকালে ফুল তুলে—"তাহাকে বাধা দিয়া গায়ত্রী কহিল—"আঃ কনক, কি সব বাজে বকৃচিস?"

কনক তাহার দিকে ফিরিয়া কহিল—"বাঃ, রোজ রোজ তুমি ফুল দিয়ে ঐ ছবিখানা পূজা কর না? আজইত আমি সেই গোলাপ দু'টো এনে দিয়েছিলুম।"

গায়ত্রী কিছু না বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। সতীশের হৃৎপিণ্ডটা দ্রুত স্পন্দনে কাঁপিয়া উঠিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

কনকের কথায় গায়ত্রী যেমন পাইল লজ্জা, তেমনি একটা আরামও অনুভব করিল। এতদিন সে নীরবে যে পূজা করিয়া আসিয়াছে, আরাধ্য দেবতার কাছে তাহা পৌঁছিয়াছে কিনা তাহা সে কখনো জানিতে পারে নাই। আজ কনক সতীশকে সেই পূজার কথা বলিয়া দিয়াছে, ভালই হইয়াছে। কিন্তু তবুও সে সতীশের সম্মুখে কিছুতেই ফিরিয়া যাইতে পারিল না, বারান্দার বেঞ্চের উপরেই বসিয়া রহিল।

চাঁপা আসিয়া কহিল—"কাকাবাবু তোমার খোঁজ করচেন।"

"তাঁকে এখানেই নিয়ে আয়, চাঁপা।"

সতীশ আসিতেই গায়ত্রী উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে বসিতে বলিল। চাঁপা মেয়েদের পড়ার ব্যবস্থা করিতে চলিয়া গেল।

গায়ত্রী কহিল—"আপনাদের বাড়ীর কোন খবরইত জিজ্ঞাসা করিনি! বাবা, মা সব ভাল আছেন? মনোরমা ইস্কুল বোধ হয় ভালই চালাচ্ছে। কমলের খবর কি?"

সতীশ প্রথম দুই প্রশ্নের উত্তর দিল, কিন্তু কমলা সম্বন্ধে কোন কথাই কহিল না।

গায়ত্রী আবার জিজ্ঞাসা করিল —"কমল চিঠি পত্তর লেখে না?" সতীশ তবুও কোন কথা কহিল না।

"চুপ করে রইলেন যে সতীশবাবু? সে ভালো আছে ত?"

সতীশ হেমেন্দ্রলালের কাণ্ড আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না। নারীর লাঞ্ছনার কথা নারীর বুকেও বিষম বিঁধিল, গায়ত্রীও আচ্ছন্নের মত বসিয়া রহিল।

সতীশ কহিল—"আমি তাকে এত করে বল্লুম ও পাপ গৃহ ছেড়ে চলে আসতে, কিন্তু কিছুতেই সে রাজী হলো না। কমলও যে সেকেলে মেয়েদের মত শত লাঞ্ছনা সয়েও পতিদেবতার পূজাকেই জীবনের সর্ব্বস্ব বলে মেনে নেবে, তা আমি কোন দিনই ভাবিনি। যত দিন তার স্বামীর সুপথে ফিরবার আশা ছিল, ততদিন আমিই তো তাকে ধৈর্য্য ধরে থাকতে বলেচি, কিন্তু ধৈর্য্যেরও তো একটা সীমা আছে! আজ সে দেখ্‌চে, তার স্বামী নাকি ক্ষণিকের দুর্ব্বলতার বশে এই সব কুকাজ করচে। কুকাজ যে তার স্বভাব, হাজার ধুলেও তার ময়লা কাটবে না, একথা তাকে আমি বোঝাতে পারলুম না। তাই আমার মনে হয়, আপনি ঠিকই বলেছিলেন, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার চেয়ে সামাজিক দুরবস্থার দিকে নজর দেওয়াই বেশী দরকার।"

গায়ত্রী চুপ করিয়া কথাগুলি শুনিয়া যাইতেছিল, কোন কথা বলিল না।

সতীশ আবার বলিল—"অন্যায় দেখলে তার প্রতিবিধান করতে তৎপর না হওয়া আমি চরিত্রের দৌর্ব্বল্য বলেই মনে করি। আমাদের সমাজ ছেলেমেয়েদের, জন্ম অবধিই, এমনি দুর্ব্বল করেই রাখচে। এই সমাজকে আগে ভাঙতে হবে, এর সমস্ত বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে হবে। আমি আশা করেছিলুম যে, প্রয়োজন হলে এ বিদ্রোহ করতে কমল পিছ-পা হবে না—কিন্তু এখন দেখচি, কমলও সমাজের অস্বাভাবিক নির্দ্দেশ মাথা পেতে নিয়েচে, সেও নিজেকে অবলা মনে করেই দুর্ব্বলতাকেই তার ভূষণ বলে গ্রহণ করেচে।"

বাগানের প্রান্তের ঝাউগাছগুলির মাথার উপরে একখানা কালো মেঘ জমিয়া উঠিয়াছিল। সেইদিকে চাহিয়াই গায়ত্রী বলিল—"না, সতীশবাবু। কমলকে আপনি ভুল বুঝবেন না।"

সতীশ বিস্ময়ে গায়ত্রীর মুখের দিকে কিছুকাল চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল—"আমি ভুল বুঝব কমলকে! আমি তাকে যেমন করে জানি, তেমন করে তাকে আর কে জানে?"

"আপনি তার সবটা জানেন না।"

"কি আপনি বলেছেন!"

"অনেকটা আপনি জানেন, তা আমি স্বীকারই করচি সতীশ বাবু—কিন্তু তার অন্তর্য্যামী ছাড়া সবখানি কেউ জানতে পারে না! আপনি যদি জানতেন, তা হলে স্বামীর ঘর ছেড়ে আপনার সঙ্গে আসেনি বলে আপনি এমন ক্ষুব্ধ হতেন না।"

সতীশ কহিল—"কিন্তু আপনি ভুলবেন না যে, তার স্বামী বিবাহের পর থেকেই শুধু তার নারীত্বের অবমাননাই করচে।"

"কিন্তু সে অবমাননার চেয়েও তার বুকে বেশী ব্যথা দিয়েচে, স্বামীর অসহায় অবস্থা, তার দুর্ব্বলতার গ্লানি।"

সতীশ চুপ করিয়া রহিল।

গায়ত্রী আবার বলিল—"মা, বাপ, ভাই-বোনের সঙ্গে ব্যবহার করে নারী-প্রকৃতির সবখানি প্রকাশ পায় না, সতীশ বাবু।"

সহসা মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। সতীশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"ইস্ বড্ড যে জল এল!"

"বসুন না জল এখনই থেমে যাবে।" বলিয়া গায়ত্রী বেতের চেয়ারখানা তাহার সম্মুখে আগাইয়া দিল। সতীশ বসিয়া কহিল—"কিন্তু কি করি বলুন তো। কমলের এ লাঞ্ছনা তো আমি সইতে পারিনে।"

গায়ত্রী কহিল—"এর প্রতিকারের উপায় আপনার আমার হাতে নেই, সতীশ বাবু—সমাজও এখানে কিছুই করতে পারবে না। যদি

বুঝতুম যে, কমল তার স্বামীর ব্যবহারে নিজেকে এতটা অপমানিত বোধ করচে যে, দাম্পত্য-বন্ধন তাহার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠছে, তা'হলে সে বন্ধন খুলে না দেবার জন্য সমাজকে দোষ দিতে পারতুম। কিন্তু এখানে তো সে প্রশ্নই উঠচে না। স্বামীর লাঞ্ছনা বুকে নিয়েও কমল স্বেচ্ছায় যে ভাবে থাকতে চায়, আপনার মতের জোরে তাকে টেনে আনা তো ঠিক হবে না! তা যদি করতে চান, তাহলে সেই রকম জবরদস্তির জন্য আপনাকেও দোষী করতে হবে, যার জন্য আপনি সমাজকে দোষী করচেন।"

জলের ঝাপ্টা আসিয়া গায়ত্রীর কাপড় ভিজাইয়া দিতেছিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া সতীশ কহিল—"এদিকে সরে বসুন না।"

গায়ত্রী হাসিয়া বলিল—"জলে ভিজতে বেশ লাগচে, সতীশ বাবু! যে গরম পড়েচে!"

সতীশ উঠিয়া গিয়া গায়ত্রীর তার ধরিয়া কহিল—"না, না—সরে বসুন। জলে ভিজে আপনার শেষটায় অসুখ করবে। আর আপনি অসুস্থ হয়ে পড়লে আপনার স্কুলের মেয়ে বেচারাদের কি দুরবস্থাই হবে বলুন তো!"

সতীশ হাত ধরিতেই গায়ত্রীর সমস্ত শরীরে যেন একটা বিদ্যুতের প্রবাহ বহিয়া গেল, তাহার বুকের ভিতরটায় যেন একটা প্রবল ঝড় উঠিল। দুই হাতে সতীশের হাত চাপিয়া ধরিয়া সে কহিল—"আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে জানেন, সতীশ বাবু? ইচ্ছে হচ্ছে এই আঁধার রাত, এই বৃষ্টির মাঝেই আপনার হাত ধরে বেরিয়ে পড়ি, আর বাগানময় কেবল ছুটোছুটি করি।"

সতীশের মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। সে গায়ত্রীর উজ্জ্বল চোখ দুটির পানে চাহিয়াই রহিল আর দুজনের চোখের সেই

নীরব কথা যখন তাহাদের মর্ম্ম স্পর্শ করিল, তখন উভয়েই মুখ ফিরাইয়া লইয়া নিজ নিজ আসনে বসিয়া পড়িল। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ কোন কথা কহিতে পারিল না, তাহাদের অন্তরের সমস্ত শক্তিই যেন ব্যাকুল দৃষ্টিপথ দিয়া বাহির হইয়া গেল!

নীরবে বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। গায়ত্রী কহিল—"আমার কি মনে হয় জানেন, সতীশ বাবু? সমাজকে ভাঙা যেমন দরকার,—তেমনি দরকার ব্যক্তিকেও গড়ে তোলা। ব্যষ্টিকে উপেক্ষা করে সমষ্টি নিয়েই যতদিন আমরা টানাটানি করব, ততদিন মানুষের অবিচার থেকে মানুষকে আমরা কিছুতেই মুক্ত রাখতে পারব না। সমাজকে ভাঙলে কি হবে, সতীশ বাবু? যদি নতুন সমাজের প্রতি মানুষকে নতুন ছাঁচে ঢালাই না করা যায়, তাহলে অমঙ্গল আপনিই গজিয়ে উঠবে—নতুন তুদিনেই পুরাতনের কদর্য্যতার মাঝে আপনার নবীন-শ্রী হারিয়ে ফেলবে।"

সতীশ কোন জবাব না দিয়া শুধু শুনিয়াই যাইতেছিল। গায়ত্রী আবার কহিল—"আমরা সমাজকে নতুন করে গড়বার আশায় যে সব প্রতিষ্ঠান খাড়া করচি, আসলে কিন্তু সেগুলি কাঠামো। আমরা যদি মনে করি এই কাঠামো তৈরী করেই জাতি হিসাবে আমরা অনেকটা এগিয়ে যাব, তা হলে ভুল হবে। প্রাণকে জাগাতে হবে জাতির বুকে বুকে—আর যতদিন না তা সম্ভবপর হবে, ততদিন হাজারো কাঠামো গড়ে আমরা জাতির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে পারব না।"

সতীশ এ কথাগুলি মানিয়া লইল। পল্লীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প লইয়া সে এতদিন নিজের সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়াছে গড়িয়াও তুলিয়াছে সুন্দর একটা অনুষ্ঠান। কিন্তু কি এক বস্তুর অভাবে যেন সে অনুষ্ঠানটি প্রাণময় হইয়া উঠিতেছে না, আপন শক্তিতে আপনিই বাড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না।

বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল। গায়ত্রী উঠিয়া বারান্দার রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সতীশ আসন ছাড়িয়া তাহারই পাশে দাঁড়াইয়া কহিল—"আপনি যা বল্লেন, তা সত্যি। আমরা যা গড়েচি, তা কাঠামো মাত্র, শুধু ওই করেই জাতির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হবে না।"

আবার দুজনা দুজনের চোখের দিকেই পলকবিহীন নেত্রে চাহিয়া রহিল—আবার চোখের তেম্নি নীরব ভাষা তেম্নি করিয়াই দুজনার মন দোলাইয়া দিল—আবার দুজনাই অজ্ঞাত কোন কারণে পরস্পরের নিকট হইতে সরিয়া গেল!

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

দমদমা হইতে ফিরিবার সময় ট্রেনে উঠিয়া সতীশ দেখিল বিনোদ একখানা বেঞ্চ অধিকার করিয়া ঘুমাইয়া রহিয়াছে। সতীশ তাহাকে ভালো করিয়া নাড়া দিয়া কহিল—"উঠে বসুন, মশাই।"

চোখ না মেলিয়াই বিনোদ জবাব দিল—"ঢের যায়গা পড়ে রয়েছে! ওদিকে গিয়ে বসুন না।"

"আমাকে এই বেঞ্চেই বসতে হবে। উঠুন আপনি।"

"উঠ্‌বার ইচ্ছা এখন আমার মোটেই নেই।" বলিয়া বিনোদ পাশ ফিরিয়া শুইল।

সতীশ দুই হাত দিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—"ওরে রাস্কেল, একবার চেয়েই দেখ্‌না।"

"সতীশ! তুই? কোত্থেকে আসচিস ভাই?" বলিতে বলিতে বিনোদ উঠিয়া সতীশকে পাশে বসাইল।

সতীশ কহিল—"এই দমদমা থেকেই উঠ্‌ছি।"

"এখানে কে আছেন।"

সতীশ কহিল—"গায়ত্রী।"

"তিনি আবার কে?"

"তাঁকে তুমি জান বিনোদ। আনন্দমোহন বাবুর কন্যা—সেই যিনি আমাদের গাঁয়ে গিয়েছিলেন মেয়েদের মাঝে কাজ করতে।"

বিনোদ একটু হাসিল। তারপর কহিল—"তিনি তোর স্কন্ধে এখনও ভর করে আছেন নাকি?"

সতীশ কহিল—"মেয়েদের সম্বন্ধে কথা বলবার সময় একটু সংযত হওয়া উচিত।"

বিনোদ সতীশের মুখের দিকে চাহিয়া হাতযোড় করিয়া কহিল—"মাপ করো ভাই। আমি ভুলে গিয়েছিলুম যে, এই দেবীটীই হচ্ছেন তোমার কল্পনা জগতের আদর্শ নারী!"

সতীশ একটুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—"গায়ত্রী সম্বন্ধে তুমি কিছু জান না বলে বরাবরই তাঁর প্রতি তুমি অবিচার করে আসচ। গায়ত্রী সত্যই সাধারণ নারী নয়—তার চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য আছে।"

"সত্যি নাকি!" বলিয়া বিনোদ আবার হাসিয়া উঠিল।

সেই হাসি সতীশের বুকের ভিতর প্রচুর বেদনা জমাইয়া তুলিল।

"না, না। এ আমি কখনো সহ্য করব না। না জেনে, না শুনে তুমি কারু সম্বন্ধে কোনরূপ বিরুদ্ধ ধারণা পোষণ করতে পারবে না।" বলিয়া সতীশ গায়ত্রীর জীবন ও আদর্শের কথা বিনোদকে বলিল।

সকল শুনিয়া বিনোদ কহিল—"কিন্তু সতীশ, মাতৃত্ব যে নারী উপেক্ষা করে, মাতৃত্বের মাধুর্য্য যে বোঝে না, তাকে দিয়ে সমাজের কোন মঙ্গল কি হতে পারে?"

"কেন পারবে না, তা তো আমি বুঝিনে! আর গায়ত্রী যে মাতৃত্বের মাধুর্য্য বোঝেনি, তাই-ই বা তোমায় কে বল্লে? তা যদি সে না বুঝত তাহলে কি সমাজ-পরিত্যক্তা, উপেক্ষিতা, লাঞ্ছিতা অভাগীদের সে এমন করে বুকে তুলে নিতে পারত? জননী না হলেও নারী যে মা হতে পারে, আমরা হিন্দুরা তা বিশ্বাস করি। গায়ত্রী তাই হয়েচে।"

বিনোদ কোন কথা কহিল না। সতীশ আবার কহিল—"নিজের রক্ত মাংস দিয়ে গড়া যে সন্তান, তার প্রতি স্নেহের টান তো স্বাভাবিক—তাকে ভালোবাসা, তার কল্যাণে স্বার্থত্যাগ করা—সে তো অনেক সহজ, বিনোদ। কিন্তু পরকে আপন করে নেওয়া, নিজেকে একেবারে

সঁপে দেওয়া পরেরই সেবায়—সেই তো মানুষের পক্ষে কঠিন। মাতৃত্বের প্রয়োজনীয়তাও তো সেখানে। গায়ত্রী যখন একেবারেই সে শক্তি লাভ করেচে, তখন কেন সে মাতৃত্বের আদর্শ ছোট করে দেখবে? সে যে আকাশেরই মত মুক্ত, সৌরকরের মতই সঞ্জীবনী শক্তির অধিকারিণী।"

ট্রেনে শিয়ালদহে পৌঁছিলে বিনোদ কহিল—"চল্ সতু, আজ রাতে আমার হোষ্টেলেই থাকবি। তোর গায়ত্রী দেবীর কথাটা একটু ভাল করেই শুনে নেব।"

হোষ্টেলে আহারের পর দুই বন্ধু ছাতে গিয়া বসিল। বিনোদ একটা চুরুট ধরাইয়া কহিল—"আচ্ছা সতু, হতাশ প্রেম সম্বন্ধে তোর কি ধারণা?"

"তোমার প্রশ্নটাই আমি বুঝতে পারলুম না।"

বিনোদ সতীশের চোখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল—"আচ্ছা এটাতো জানিস, যে, পাশ্চাত্য দেশের মেয়েরা প্রেমে পড়ে প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলতে না পেরে সহসা সাত্ত্বিক হয়ে কন্‌ভেণ্টের কঠোর জীবন বরণ করে নেয় বা সহসা বিশ্ব-প্রেমিক হয়ে দাঁড়ায়।"

সতীশ কহিল—"জানি। তাই কি?"

"তোর এই দেবীটিও যদি তেমনি কারু প্রেমে পড়ে শেষটায় হতাশ প্রেমের তাড়ায় এ কাজে প্রবৃত্ত হয়ে থাকেন?"

"তাতেও তো প্রমাণিত হয় না যে, তিনি এ কাজের উপযুক্ত নন। প্রেম তাঁর অন্তরে ছিল বলেই তো তিনি এমন করে এই সব মেয়েদের আপন করে নিতে পেরেচেন। তাঁর প্রেম যে রূপান্তরিত হয়ে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেচে। বাসনা, কামনা, স্নেহ, ভালবাসা, মানুষের মাঝে

তো থাকবেই। মানুষ তাকে যত রূপান্তরিত করে স্বার্থের গণ্ডীর যত বেশী ঊর্দ্ধে উঠ্‌তে পারবে, তত বেশীই তো সমাজের জগতের কল্যাণ হবে। প্রেম ছিল বলেই তো বিল্বমঙ্গলের প্রেম রূপান্তরিত হয়ে ভাগবৎ-প্রেমে পরিণত হয়েছিল আর প্রেম থাকে না বলেই কৌপীনধারী ভস্মমাখা সন্ন্যাসী হঠযোগের হাজার কসরৎ করেও পাবার মত কিছুই পায় না।”

বিনোদের মনে হইতেছিল এসব কথার জবাব আছে, কিন্তু ভালো করিয়া জমাইয়া সে জবাব দিতে পারিল না। দু’চারবার চেষ্টা করিয়া সে অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল।

পরদিন প্রভাতে মেসে ফিরিয়া সতীশ যাহাকে দেখিতে পাইল, তাহার সহিত যে এমন ভাবে দেখা হইবে, তাহা সে কখনো মনে করে নাই। সতীশ দেখিল হেমেন্দ্র তাহারই বিছানায় শুইয়া রহিয়াছে। পায়ের শব্দ শুনিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল—“তুমি এখানে!”

হেমেন্দ্র কহিল—“বাড়ী ফিরে দেখলুম, আমার অনুপস্থিতি এক বিষম কাণ্ড ঘটিয়েচে। শুনলুম আপনি অবধি গিয়েছিলেন। আমি কমলকে নিয়ে আপনাদের ওখানে গেলুম, শুনলুম মনের দুঃখে আপনি বিবাগী হয়ে বেরিয়ে পড়েচেন।” বলিয়াই হেমেন্দ্র হাসিতে লাগিল।

সতীশ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার মুখ দিয়া একটিও কথা বাহির হইল না।

হেমেন্দ্র আর একখানি চেয়ার টানিয়া তাহার পাশে বসিয়া কহিতে লাগিল—“শুনুন, ঘটনাটা আপনায় খুলেই বলি। আমি এসেছিলুম একটি নারীকে নিয়েই—কিন্তু সে পতিতা নয়, সাধ্বী। কোন মন্দ অভিপ্রায়েও তাকে আমি আনিনি। কমলাকে আপনি যে জন্য

আমাদের বাড়ী নিয়ে গিয়েছিলেন, ঠিক সেই জন্যই আমি একে নিয়ে এসেছিলুম। পতির জন্য স্বাধ্বীর যে বেদনা, কমল আমায় ভালো করেই তা বুঝিয়ে দিয়েচে। এর স্বামী ছিল আমার অধঃপতনের সঙ্গী। আমি এত দিনের চেষ্টায় স্বামী-স্ত্রীর মিলন ঘটিয়ে দিয়েচি। এবার চলুন, ঘরের ছেলে আমরা ঘরে ফিরে যাই।”

হেমেন্দ্র হাসিতে হাসিতে ঘরময় বেড়াইতে লাগিল—সতীশ বিস্মিত-নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

বাড়ী পৌঁছিয়া নৈশ ভোজনান্তে সতীশ তাহার পড়ার ঘরে বসিয়াছিল। মনোরমা ও কমল তাহার কাছে গিয়া গায়ত্রীর সংবাদ জানিতে চাহিল। সতীশ গায়ত্রীর বিদ্যালয় দেখিয়া আসিয়াছিল, তাহাই বলিতে লাগিল।

সমস্ত শুনিয়া মনোরমা কহিল—“দিদির কিন্তু আশ্চর্য্য ক্ষমতা।”

সতীশ বলিল—“গায়ত্রী মানবী নয় মনু, সে দেবী।”

“আর সে দেবীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা তুমি করেচ, দাদা।” বলিয়া কমলা সতীশের দিকে চাহিল।

“না রে, কমল—তা নয়। আমার সঙ্গে তার পরিচয় হবার আগে থেকেই এই রকম একটা কিছু করবার সঙ্কল্প সে করেছিল—সুধীর আমায় বলেছে। গায়ত্রী এই জন্য এম এ পর্য্যন্ত পড়ল না।”

“তা হতে পারে। কিন্তু, কাজ করবার শক্তি তার অন্তরে তুমিই জাগিয়ে তুলেছ, যেমন করেছ আরও তাদের, যারা তোমার সংস্পর্শে এসেছে।”

“সে আবার কারা, কমল ?

মনোরমা বলিল—“একজন ত আমিই সাম্‌নে রয়েছি।”

কমল কহিল—“আমিও একজন।”

"আর—বল্‌ব ঠাকুরঝি ?" বলিয়া মনোরমা কমলার দিকে চাহিয়া হাসিল।

কমলা বলিল—"বলনা"

"আর—হেমবাবু, গাঁয়ের কৃষকেরা, পল্লীর বধূরা, স্কুলের ছেলেরা—সকলেই।"

কমলা হাসিয়া কহিল—"হাঁ, মহিম খুড়ো ছাড়া আর সকলেই।"

সতীশ বলিল—"থাক্। অত বুদ্ধির পরিচয় তোমাদের আর দিতে হবে না।"

কমলা কহিল—"কিন্তু এ কথা কি সত্যি নয় দাদা যে, তুমি না হলে জীবনের এই নতুন আনন্দ আমরা কেউ উপভোগ করতে পারতুম না ?"

সতীশ বলিল—"আমরা, ভারতবর্ষের লোকেরা, একদিন প্রাণের অবমাননা করেছিলুম তার স্ফূর্ত্তিকে বাধা দিয়ে, তার গতিকে জড়তার বোঝা চাপিয়ে ভারি করে তুলে। তাই ওই প্রাণ আমাদের একদিন পরিত্যাগ করে গিয়েছিল।

"তাকে হারিয়ে তবে না আমরা বুঝলুম কি ছিল তার শক্তি! শতরকমের দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে সেই না আমাদের ঠিক্ ঠিক্ চালিয়ে নিয়েছিল—আর তার অভাবেই না আমরা গলিত শবের মত দুনিয়ায় ঘৃণ্য হয়ে পড়েছিলুম!

"এইটেই যখন বুঝলুম। তখনই আমরা প্রাণের পূজা সুরু করে দিলুম। সকলের সমবেত প্রার্থনায় সে আবার আমাদের বুকের ভিতর এসে মৃদু-স্পন্দনে নেচে উঠ্‌ল।

"এই যে প্রাণ, একেই পূর্ণ-জাগ্রত করতে হবে, সকল রকম বন্ধন হতে একে একেবারে মুক্ত করে দিতে হবে। আজ বুকের মাঝে কেবল যার স্পন্দন অনুভব করচ, সে যখন সমস্ত দেহ-মন কাঁপিয়ে তুল্‌বে

নব নব ভাবের আবেগে—নতুন নতুন কর্ম্মের উদ্দীপনায়, তখনই প্রাণের পূর্ণ-প্রতিষ্ঠা হবে।

"এই প্রাণের উপাসনায় তনু-মন ঢেলে দেওয়াই হচ্ছে নবযুগের সাধনা। গায়ত্রী সেই সাধনার পথেই অগ্রসর হয়েছে।"

মনোরমা কহিল—"দিদির স্কুলটা একবার দেখতে ইচ্ছা ক' '।"

সতীশ বলিল—"একবার তোমাদের নিয়ে যাব সেখানে।"

"কথায় কথায় ভুলেই গেছি, দাদা! তোমার যে এক গাদা চিঠি রয়েচে" বলিয়া কমলা উঠিয়া ড্রয়ারের ভিতর হইতে কতগুলি চিঠি বাহির করিয়া সতীশের সম্মুখে রাখিল।

মনোরমা কহিল—"একখানা আমেরিকা থেকে এসেছে।"

সতীশ ক্ষিপ্রহস্তে সেই চিঠিখানি বাছিয়া লইয়া খুলিয়া দেখিয়াই বলিল —"চারু......চারু লিখেচে, কমল।"

উত্তেজনায় তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিতেছিল। চিঠিখানা সে দুইবার করিয়া পড়িল। তারপর কহিল চারু আমেরিকায় গিয়ে কৃষি-কলেজে ভর্ত্তি হয়েচে—তার বাবাকে আমি এখনই খবর দিয়ে আসি।" বলিয়া তখনই সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

কমলা কহিল—"একটা চাকরকে আলো নিয়ে সঙ্গে যেতে বল।"

সতীশ সে কথার কোন উত্তর না দিয়া দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

রাত্রি তখন দুই প্রহর।

সম্পূর্ণ।